পঞ্জাবের কৃষক নেতাদের আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের স্বার্থবিরোধী—পৃঃ ২৩

স্বস্তিকা

দাম : বারো টাকা

পঞ্জাবের কৃষক আন্দোলন খালিস্তান আন্দোলনেরই নামান্তর — পৃঃ ১৫

৭৩ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা।। ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১।। ২ ফাল্গুন - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২।। website : www.eswastika.com

পিএম কিষান সম্মান নিধি

১০০ শতাংশ কেন্দ্রীয় অর্থে বছরে ৬ হাজার টাকা পাবেন কৃষক।

পিএম কিষান সম্মান নিধি

ভারতে প্রায় ১৪ কোটি কৃষক এই অর্থ পাবার যোগ্য। পশ্চিমবঙ্গে এই সংখ্যাটা প্রায় ৭০ লক্ষ।

পিএম কিষান সম্মান নিধি

ভারতে এখনও পর্যন্ত ১০ কোটি কৃষক এই অর্থ পেয়েছেন। রাজ্য সরকারের বিরোধিতার ফলে পশ্চিমবঙ্গে একজন কৃষকও এই টাকা পাননি।

কৃষি বিল ২০২০ - সরকারের প্রতিশ্রুতি

কৃষকরা তার উৎপাদিত ফসল যে কোনো জায়গায় বিক্রি করতে পারে। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য হেরফের হবে না। বর্তমানে যেসব মান্ডি চালু আছে সেগুলো যথারীতি চলবে।

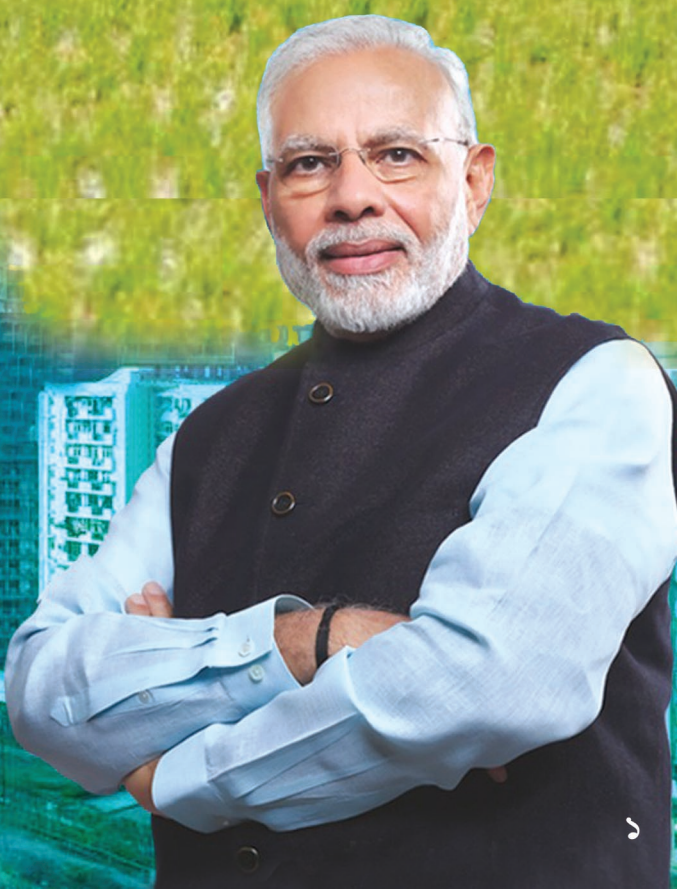

কৃষকদের স্বার্থেই কেন্দ্রীয় কৃষি বিল। গুটিকয়েক কৃষকবেশী ফড়েদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার ভয়েই এরা কৃষক আন্দোলনের নামে অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। এতে শামিল হয়েছে ভারতবিরোধী শক্তি ও কিছু রাজনীতির কারবারি। সাধারণ কৃষক কিন্তু এই আন্দোলনে শামিল নেই।

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৩ বর্ষ ২৫ সংখ্যা, ২ ফাল্গুন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

১৫ ফেব্রুয়ারি - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

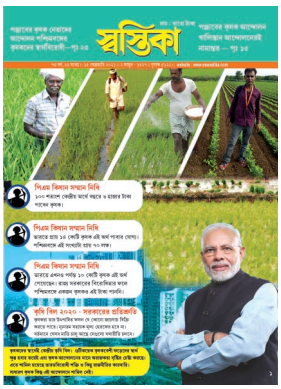

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের দায়িত্ব গণতন্ত্র রক্ষায়, দলাদলিতে নয় ▯ বিশ্বামিত্র ▯ ৬

দেড় কোটি কর্মসংস্থান, তৃণমূলের জয় হোক ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

কোভিডের ভ্রূকুটি পেরিয়ে সমৃদ্ধির বাজেট ▯ এন চন্দ্রশেখরণ ▯ ৮

শ্রীরামচন্দ্রের চিত্র সংবিধানকে জীবন্ত করে তুলেছে ▯ অজয় সরকার ▯ ১১

নিজের ঘরের কৃষকদের বঞ্চনা করে, তিনি নাকি কৃষকদরদি! ▯ বিশ্বপ্রিয় দাস ▯ ১৩

এবারের বাজেট নিঃসন্দেহে সাহসী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ▯ কুণাল চট্টোপাধ্যায় ▯ ১৪

পঞ্জাবের কৃষক আন্দোলন খালিস্তান আন্দোলনেরই নামান্তর ▯ সুজিত রায় ▯ ১৫

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে পালা বদলের জন্য ▯ কল্যাণ চক্রবর্তী ▯ ১৮

পঞ্জাবের কৃষক নেতাদের আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের স্বার্থবিরোধী ▯ দীপ্তাস্য যশ ▯ ২৩

নতুন কৃষি আইনে লাভবান হবেন পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা ▯ কল্যাণ জানা ▯ ২৮

নদী থেকে দেবী সরস্বতী নানা রূপে ▯ নন্দলাল ভট্টাচার্য ▯ ৩১

সূর্যই সকল প্রাণীর আত্মাস্বরূপ ▯ অমিত ঘোষদস্তিদার ▯ ৩৩

সারা বিশ্বে দেশকে অপমান করার দায় নিতে হবে কৃষক নেতাদের ▯ ধীরেন দেবনাথ ▯ ৩৫

ভারতের বহু ইকবাল হৃদয়ে ব্যথা নিয়ে বাস করছেন ▯ গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৩৭

রামমন্দির না দেখেই চলে গেলেন গজানন বাপট ▯ উত্তম কুমার মাহাতো ▯ ৪৩

শ্রীশ্রী করুণাময়ী মন্দির ইতিহাসের নীরব সাক্ষী ▯ জয়ন্ত পাল ▯ ৪৪

বাঙ্গালির সারস্বতচর্চার এক অবহেলিত অধ্যায় ▯ মানিক হালদার ▯ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ অঙ্গনা : ২১ ▯ সুস্বাস্থ্য: ২২ ▯ খেলা : ৩৯ ▯ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ▯ চিত্রকথা : ৪২ ▯ উবাচ : ৪৯▯ শব্দরূপ : ৫০

প্রকাশিত হবে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১

একুশে ফেব্রুয়ারি : ভাষা দিবস না কি হতাশা দিবস

একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে রাষ্ট্রপুঞ্জ আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতেই এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু প্রশ্ন হলো, একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস না কি হতাশা দিবস? কারণ, ভাষা আন্দোলনের পর থেকেই বাংলাদেশে বাংলা ভাষার আরবিকরণের কাজ শুরু হয়েছিল। এখন বাংলাদেশে 'বাংলা ভাষা' নামে যে ভাষাটি প্রচলিত, তার সিংহভাগ শব্দই আরবি অথবা ফারসি। এই আরবীকরণের ঢেউ এসে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গেও। রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে চলছে আরবিকরণের কাজ। ইংরেজি 'স্কাই' শব্দের বাংলা অর্থ লেখা হচ্ছে 'আশমান'। 'ফাদার' হয়ে যাচ্ছে 'আব্বু'। সুতরাং একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে ভাষা দিবস না বলে বাংলা ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে 'হতাশা দিবস' বলাটাই যুক্তিসংগত হবে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে এই নিয়ে কিছু তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা।

দাম একই থাকছে— মাত্র ১২ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বিরোধীদের ধ্বংসাত্মক রাজনীতি

ভারতবাসীর নিকট ভারতের সাধারণতন্ত্র বা গণতন্ত্র দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম। স্বাধীনতা দিবসের চাইতে তাহা কোনো অংশেই কম নহে। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দেশ স্বাধীন হইলেও দেশের প্রধান হিসাবে বহাল ছিলেন ষষ্ঠ জর্জ এবং গভর্নর জেনারেল ছিলেন লুই মাউন্টব্যাটেন। দেশে তখন স্থায়ী আইন ছিল না। ঔপনিবেশিক আইনেরই কিছু রদবদল করিয়া দেশ শাসনের কাজ চলিতেছিল। ১৯৪৭ সালের ২৮ আগস্ট দেশের সংবিধান রচনার জন্য ড্রাফটিং কমিটি গঠন করা হয়। দুই বৎসর এগারো মাস আঠরো দিন ব্যাপী সময়ে গণপরিষদে ১৬৬ বার সংবিধানের খসড়া লইয়া চুলচেরা বিচার হইয়াছে। অবশেষে ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর স্বাধীন ভারতের সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হইবার পর ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রথম স্বাধীনতা দিবসের সংকল্প গ্রহণের দিনটিকে শ্রদ্ধা জানাইয়া ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতের সংবিধান কার্যকর হয়। এই দিনটিতেই প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ শাসন চিরতরে অপসারিত হইয়া ভারত প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। সেই কারণেই ভারতবাসী এই পবিত্র দিনটিকে বিশেষ মর্যাদায় পালন করিয়া থাকে। এই দিনটিতে দিল্লিতে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ভারতের সেনাবাহিনী তাহাদের শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন করিয়া থাকে। ভারতের অঙ্গ রাজ্যগুলিও দেশের জাতীয় রাজধানীতে তাহাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচিতি প্রদান করিয়া থাকে। এই বিশেষ দিনে বিশ্বের কোনো কোনো দেশের রাষ্ট্রপ্রধান অতিথি হিসাবে আমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। স্বভাবতই দিনটি ভারতবর্ষের একটি গৌরবময় দিন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হইল, এই রকম একটি গৌরবময় দিনে দেশের একটি অংশের কতিপয় কৃষক সংগঠন কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষিবিলের বিরোধিতায় আন্দোলনের নামে দিল্লিতে অরাজকতা সৃষ্টি করিয়া, ঐতিহ্যময় লালকেল্লার প্রাচীরে উড্ডীয়মান জাতীয় পতাকার যেই ভাবে অপমান করিয়াছে তাহাতে বিশ্বের সামনে ভারতের সম্মান হানি হইয়াছে, লজ্জায় ভারতবাসীর মাথা নত হইয়াছে। আরও দুঃখের হইল, কৃষকদের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার যে আইন আনিয়াছে, বিপক্ষ দলগুলি কৃষকদের বিভ্রান্ত করিয়া তাহাদের উগ্র করিয়া তুলিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এই নতুন কৃষি আইনে কৃষকরা লাভবান হইবেন বলিয়া বার বার আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস-সহ বিপক্ষ দলগুলি কৃষক সংগঠনের আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করিতেছে। কৃষকদের আন্দোলন এমন পর্যায়ে গিয়াছে যে, গণতন্ত্র দিবসের পবিত্র দিনটিকেও তাহারা কলুষিত করিয়াছে। প্রথম হইতেই এই আন্দোলনে দেশবিরোধী শক্তির পাশাপাশি বিদেশি শক্তিরও উসকানি রহিয়াছে। ভারতের রাষ্ট্রপতি খেদ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, ' সাধারণতন্ত্র দিবসে যে হিংসার ঘটনা ঘটিয়াছে এবং জাতীয় পতাকার অবমাননা করা হইয়াছে তাহা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।' প্রধানমন্ত্রীও অনুরূপ ভাষায় দুঃখ ব্যক্ত করিয়াছেন।

আরও দুর্ভাগ্যজনক হইল, বিপক্ষ দলগুলি এই অরাজকতার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকেই দায়ী করিতেছে। বিরোধী দলগুলি যথার্থ বিরোধী ভূমিকা পালন না করিয়া ধ্বংসাত্মক রাজনীতিতে মাতিয়াছে। ইহা সংসদীয় রাজনীতিতে শুভ লক্ষণ নহে। আরও একটি ভাবিবার বিষয় হইল, দেশের একটি ক্ষুদ্র অংশের তথাকথিত কৃষকরা এই আন্দোলনে শামিল হইয়াছে, তাহা দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। কেন্দ্রীয় সরকার বার বার তাহাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাইতেছে। ইহার মধ্যে বাহিরের দেশের প্ররোচনা কোনোভাবেই কাম্য নহে। আমাদের দেশের নীতিহীন বিরোধী দলগুলি তাহাদেরও স্বাগত জানাইতেছে। ইহা আজ দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে যে, আন্দোলনকারী সংগঠনগুলির লক্ষ্য কৃষকদের সমস্যা সমাধান করা নয়, তাহাদের লক্ষ্য দেশের নির্বাচিত সরকারকে অপদস্থ করা। সাধারণতন্ত্র দিবসের ঘটনায় ইহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

সুভাষিতম্

সর্বে যত্র বিনেতারঃ সর্বে যত্রাভিমানিনঃ।

সর্বে মহত্ত্বমিচ্ছন্তি সর্বং তত্রাবসীদতি।।।

যেখানে সবাই নেতা হতে চায়, সবাই অতি অহংকারী, সবাই গুরুত্ব পেতে চায়, সেখানে সবার অধঃপতন অবধারিত।

গণতন্ত্রের চতুর্থস্তম্ভের দায়িত্ব গণতন্ত্র-রক্ষায়, দালালিতে নয়

বিশ্বামিত্র

ভারতে কৃষক-আন্দোলনের নামে কৃত্রিম আন্দোলন সৃষ্টি করা হচ্ছে, আর তা যখন ধরা পড়ে যাচ্ছে তখন 'ফেসবুক মিম'কে আশ্রয় করে দৃষ্টি অন্যদিকে ঘোরানোর চেষ্টা হচ্ছে। 'মিম' বস্তুটি হলো একপ্রকার ব্যঙ্গ-কৌতুক। ফেসবুকে বিশেষ করে মিথ্যে কল্পনাকে কেন্দ্র করে এই ব্যঙ্গ-কৌতুকের নির্মাণ হয়। ফলে অনেক গোয়েবলসীয় প্রচার সত্যি হয়। আর যদি একটি'বাজারি' সংবাদমাধ্যম একে মূলধারায় মান্যতা দেয়, তাহলে তা ভারতীয় গণতন্ত্রকে কলুষিত করার নামান্তর হয়ে ওঠে। আমেরিকান পপ সংগীত-গায়ক রিয়ানা, পর্ণ-স্টার মিয়াঁ খলিফা, গ্রেটা থুনবার্গদের টুইটারে কৃষক আন্দোলনের পক্ষে, হ্যাশট্যাগ দিয়ে 'স্ট্যান্ড উইথ ফারমার্স' ইত্যাদি বক্তব্যের বিষয়ে সকলেই জানেন। স্বাভাবিকভাবেই এবিষয়ে দেশের বিদেশ-মন্ত্রক অত্যন্ত কড়া অবস্থান নিয়েছিল। তাঁদের বক্তব্য খুব পরিষ্কার যে, কৃষক-আন্দোলন ভারতের সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ বিষয়। তাতে নাক গলানোর অধিকার দেশের অনাগরিক কারোরই নেই। বিশেষ করে আন্দোলন দমন করতে গিয়ে যখন তাতে বিন্দুমাত্র গোলা-গুলি চলেনি। উপরন্তু আন্দোলনকারীরা আন্দোলনের নামে দেশের সার্বভৌমত্বকে বারবার বিপন্ন করেছে, যেমন গণতন্ত্রদিবসের দিন লালকেল্লায় ধর্মীয় পতাকা তুলে দেওয়া ইত্যাদি; তা সত্ত্বেও দেশের সরকার ও নিরাপত্তাবাহিনী কোনওরকম অসহিষ্ণুতা দেখায়নি।

এখন যদি বলা হয়, আন্দোলনকারীদের প্রধানমন্ত্রীকে খুনের অধিকার দিতে হবে, তাহলে অন্যকথা; সেটুকু করতে দেওয়া ছাড়া আন্দোলনের নামে যাবতীয় অভ্যবতা করার সুযোগ আন্দোলনকারীদের দেওয়া হয়েছে। সুতরাং মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোনও ব্যাপার নেই যে আন্তর্জাতিকমহলে এনিয়ে উদ্বেগ ছড়াবে। বিশ্বের দরবারে মোদী-সরকার এবিষয়ে যথেষ্ট পরিষ্কার, আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের গতিবিধিও এদেশে যত্র-তত্র। সুতরাং ভারতের সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ বিষয়ে দেশের অনাগরিক কারোর মন্তব্য যে কোনও কায়েমি স্বার্থে কিংবা উস্কানিমূলক তা ধরে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। ঠিক এই ভাষাতেই প্রতিবাদ করেছেন ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট মানুষজন। যার মধ্যে আছেন লতা মঙ্গেশকর, শচীন তেণ্ডুলকর, অনিল কুম্বলের মতো ব্যক্তিত্বরা, যাঁরা আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় ভারতের প্রতিভূ-স্বরূপ। স্বাভাবিকভাবেই এতে কিছু মানুষের প্রভূত গাত্রদাহ হয়, তাঁরা সোশ্যাল মিডিয়ায় এ নিয়ে লাগাতার তোপ দেগে চলছেন, ফেসবুকে মিম বানাচ্ছেন।

একটি বাজারি পত্রিকায় সাধারণত প্রতি রবিবার সম্পাদকীয় তলায় '...কিঞ্চিৎ' শীর্ষক একটি ছোটো কলম লেখা হয়, সাম্প্রতিক ঘটনাবলির উপর ব্যঙ্গাত্মক লেখা হয় তাতে। এবারও কৃষক আন্দোলন নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক লেখা হয়েছে, তাতে নতুনত্ব নেই। কিন্তু ব্যঙ্গের তীব্রতা বৃদ্ধি করতে গিয়ে ফেসবুকীয় ভাষার যেরকম ব্যবহার করা হয়েছে এবং শালীনতার তোয়াক্কা না করে যেভাবে ফেসবুকীয় মিমকে স্পষ্টতই মান্যতা দেওয়া হয়েছে, তাতে গণতান্ত্রিক চতুর্থ স্তম্ভটি যে আরও একবার ভয়ংকরভাবে বিপন্ন হলো তা বলাই বাহুল্য। যারা পড়েননি, তাঁদের জন্য কী লেখা আছে বলা যাক। কঙ্গনা রানাউতের সঙ্গে তুলনা করে শ্লেষের সঙ্গে বলা হয়েছে, তিনি যা লেখেন তা 'গালিগালাজ' বা 'হুংকার' যাইহোক, তার লেখায় অন্তত 'স্বকীয়তা' আছে। এরপর শচীন, লতা মঙ্গেশকরদের কটাক্ষ করা হয় যে, 'আমি বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র' কিংবা 'ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান'-এর মতো গণটুকলিটা ধরা যাচ্ছে। কারণ তাঁরা সবাই 'রিসল্ভ দেম অ্যামিকেবল' অর্থাৎ সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাধানের কথা বলেছেন। এখানে বলা দরকার যে, বিদ্যাসাগর কলেজের একজন ছাত্র ও মূর্তি ভাঙার ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান ফেসবুকে অজস্র দেওয়ালে ঘুরছিল, কপি-পেস্টের এই অপশন ফেসবুকেই আছে। কিন্তু এটা ভাবার কারণ নেই, শচীন, লতার মতো জীবন্ত কিংবদন্তীরা নিজের বিচার-বিবেচনাকে বাদ দিয়ে টুইটারে কপি-পেস্ট করবেন, কিংবা শাসক-দলের তাঁবেদারি করবেন। তাঁদের পোস্টে কিছু শব্দের মিল থাকতে পারে, এটা নেহাত কাকতালীয় হতে পারে কিংবা সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাধানের সরকারি সূত্র মেনেই তাঁরা 'রিসল্ভ দেম অ্যামিকেবল' লিখে থাকতেন। কিন্তু ফেসবুকীয় এই মিমকে যদি মূলধারার কোনো সংবাদপত্র তার পাতায় লিখে তাকে মান্যতা দেওয়ার চেষ্টা করে। সেইসঙ্গে দেশের গর্বের প্রতীকগুলি অপদস্থ করার চেষ্টা করে তবে তা কেবল দেশের প্রতি অবমাননারই শামিল নয়, সেই সংবাদপত্রের প্রতি ক্লিশে হয়ে যাওয়া 'দেশদ্রোহী দালাল' শব্দবন্ধনীই পুনর্বার ব্যবহার করতে ইচ্ছে করে।

আপনাদের স্মরণে থাকতে পারে, গত বিধানসভা নির্বাচনে এই সংবাদমাধ্যমের বাম-কংগ্রেস জোটের পক্ষে বিপুল দালালি তৃণমূলকে খুব ভালোভাবে ক্ষমতায় আসীন করে। তৃণমূলও এতটা ভালো ফল আশা করেনি, কিন্তু তার মাত্র পাঁচ বছর আগেই ক্ষমতা থেকে বিদায় নেওয়া সিপিএম, যার শাসনকালে অত্যাচারের ছবি তখনও মানুষের মনে দগদগে এবং সাধারণের ধারণা ছিল, তৃণমূল-জমানা সিপিএম আমল থেকে ঢের ভালো, এখন অবশ্য সে ধারণা বদলেছে, যাইহোক সেবারে তারা কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে আবার ক্ষমতায় আসতে চলেছে, এই সংবাদগোষ্ঠীর এই প্রচারে আতঙ্কিত রাজ্যবাসী তৃণমূলকে পুনরায় নিরঙ্কুশ বিপুল ব্যবধানে ক্ষমতায় এনেছিল। এর জন্য সংবাদপত্রটির তৎকালীন সম্পাদককে পদত্যাগ পর্যন্ত করতে হয়। নতুন মাওবাদী সম্পাদকের আমলে তাদের দালালির চরিত্র বদলায়। নির্বাচন থেকে শিক্ষা নিয়ে তারা তখন তৃণমূলের সমর্থক। ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে নতুন সম্পাদককে আবার সরতে হয় আমফানের সময় মুখ্যমন্ত্রীর মনোমতো খবর না করায়। এখনও তাদের স্বভাবের পরিবর্তন যে হয়নি, তার প্রমাণ 'বাঙ্গলার যুবরাজে'র ভাষণ থেকে এই সংবাদপত্রের ডিজিটাল সংস্করণে নিন্দনীয় 'তোর বাপকে গিয়ে বল' স্বতঃপ্রণোদিতভাবে শব্দবন্ধনী কেটে উড়িয়ে দেওয়া। এই 'দালালি'র নানারকম নমুনা সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষ যে সাম্প্রতিক অতীতে দেখিয়েছেন। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে সংবাদপত্রের স্থান অত্যন্ত সম্মানের, সেখানে এই বাজারি সংবাদপত্রের দালালি সংবাদমাধ্যমের সম্মান ভূলুণ্ঠিত করছে।

দেড় কোটি কর্মসংস্থান, তৃণমূলের জয় হোক

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা,

আমার দিদি মানে আপনাদের সবার দিদি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে কিন্তু অনেক কিছু শেখার আছে। সামনে ভোট। সেই হিসেবে তাঁর হাতে সময় মেরেকেটে দিন দশেক। কিন্তু সেই ১০ দিনের জন্য ৫ বছরের বাজেট পেশ করে দিলেন তিনি। সংবিধান? ওসব প্রশ্ন তুলবেন না। নির্বাচনের আগে নিয়ম বলছে ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ করতে হয়। কিন্তু দিদি পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করেছেন। অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রকে বাড়িতে আটকে রেখে নিজেই সেটা করে দিয়েছেন। ভাবুন। রাজ্যবাসীর প্রতি কতটা ভালোবাসা ও দরদ থাকলে তবেই এমনটা করা যায়। বাজেটের আগে বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণটাও সাংবিধানিক নিয়মের মধ্যে পড়ে। কিন্তু দিদি ওসব ধার ধারেননি। মানুষের জন্য কাজ করার জন্য তিনি এতটাই উদগ্রীব ছিলেন।

দিদি বলে দিয়েছেন, আগামী ৫ বছরে দেড়কোটি কর্মসংস্থান হবে পশ্চিমবঙ্গে। এবং এটাও তিনি পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন যে এই দেড়কোটি চাকরি আসলে সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি স্তরে এবং সব কন্ট্রাক্টুয়াল কর্মসংস্থানকে ধরে। স্বাভাবিকভাবেই বিধানসভা নির্বাচনের আগে সরকারের ভিত আরও শক্ত করতে এবং ভোট-রাজনীতির অংশ হিসেবেই বাজেটের দিনে বিশাল চাকরির এই ঘোষণা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। তবে ফাঁকা

কলসিতে আওয়াজ করার মতো এই দেড়কোটি চাকরির ঘোষণা করেননি মুখ্যমন্ত্রী। আগামীদিনে রাজ্যে যে সব উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এবং শিল্পের অগ্রগতির ভিত্তিতে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে তার বিবরণীও এদিন দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। দিদি জানেন, যে এত লোককে কাজ দেওয়া সম্ভব নয়। বেতনের টাকা কোথা থাকে আসবে সেটাও তিনি জানেন না। কিন্তু আপনারা ভাবুন দিদির সদিচ্ছাটা।

২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, বাম জমানায় শিক্ষকদের প্রতি যেসব অবিচার এবং অন্যায় হয়েছিল, তার সুবিচার করবেন। তাঁর শাসনকালের প্রায় এক দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও শিক্ষকেরা ব্রাত্য এবং অবহেলিতই থেকে গেলেন। রাজ্য সরকার ২০১২ সালের টেট-কে প্রথমে উচ্চ প্রাথমিকে নিয়োগের পরীক্ষা হিসেবে মান্যতা দেয়নি। স্কুল সার্ভিস কমিশন তখন জানিয়েছিল, ওই পরীক্ষা উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রাথমিক বাছাই মাত্র। কিন্তু পরবর্তীকালে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীরা হাইকোর্টে মামলা করেন। উচ্চ আদালত সেই পরীক্ষাকে উচ্চ প্রাথমিকে নিয়োগের পরীক্ষা (টেট) হিসেবে মান্যতা দেয় এবং জানায়, ২০১২ সালের পরীক্ষাকে টেট বলেই গণ্য করতে হবে। আদালতের নির্দেশমতো পাশ-করা প্রার্থীদের টেট-উত্তীর্ণের শংসাপত্রও দেয় রাজ্য সরকার। অজানা কারণে রাজ্য সরকার আজ পর্যন্ত সেই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে উঠতে পারেনি। ফের এ বছর কলকাতা হাইকোর্ট গত তিন বছরে শিক্ষক নিয়োগ না হওয়াকে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা হিসেবে গণ্য করেছে। দিদি এসব জানেন। তবুও সদিচ্ছাটা দেখুন। ভাবুন।

২০১৬ সালে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ৬০ হাজার চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী নিয়োগের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। পরের বছর পরীক্ষার পরে নিয়োগের জন্য ৫৪২২ জনের নাম প্রকাশ করা হয়। আরও কয়েক হাজার প্রার্থীকে রাখা হয় ওয়েটিং লিস্টে। মেধা তালিকায় প্রায় ৮০০ জনের নাম থাকলেও কেউ চাকরি পাননি। এসব কোনও কথাই দিদির অজানা নয়। তবু ভাবুন। দিদির সদিচ্ছার কথাটা ভাবুন।

কোভিডের ভ্রূকুটি পেরিয়ে সমৃদ্ধির বাজেট

এন. চন্দ্রশেখরণ

দৃঢ়সংকল্প এবং পূর্ণবিশ্বাসকে সঙ্গে করে সমস্ত বিশ্বের তুলনায় করোনা মহামারীর দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলা করে ভারত অগ্রণী এবং অনুকরণীয় রূপে আবির্ভূত হয়েছে। ভারতের সংবেদনশীল এবং দায়িত্বশীল সরকার, পরিষেবা মনস্ক সমাজ, সামনের সারির করোনা যোদ্ধারা এবং আমাদের অনন্য নির্মাণ কৌশল করোনাকে পরাজিত করতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখেনি।

২০১৯-এর ডিসেম্বরে চীনের উহানের আধিকারিকরা এই নতুন ভাইরাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয়েছিল। উহান থেকে ছড়ানো বিশ্বঘাতক ভাইরাসের প্রকৃতরূপ যখন সমগ্র বিশ্বে ছড়াতে থাকলো ভারত সেই সময় সম্পূর্ণরূপে সচেতনতার সঙ্গেই এর মোকাবিলার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিয়েছিল।

৩০ জানুয়ারি ২০২০-তে ঠিক একবছর আগে ভারতের কেরল রাজ্যের নিবুরে করোনা ভাইরাসের সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। চীন ফেরত উহান ইউনিভার্সিটির এক ভারতীয় ছাত্র দেশে ফিরেছিল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ে। ৩১ জানুয়ারি, ২০২০-তে ডব্লুউএইচও করোনা ভাইরাসকে বিশ্বজুড়ে এক আন্তর্জাতিক বিপর্যয় ঘোষণা করে দেয়।

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০-তে ভারত চীন থেকে নিজেদের ৭৫৯ জন নাগরিককে এয়ারলিফ্ট করে দেশে নিয়ে এসেছে যার মধ্যে ৪৩ জন বিদেশি নাগরিকদেরও নিয়ে আসা হয়েছে। ৬ মার্চ থেকে বিদেশ থেকে আগত সবাইকে এয়ারপোর্টেই ভারতে বাছাই করা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে সংক্রমিতদের কোয়ারেন্টাইনে রাখাও শুরু করে দিয়েছিল। ১১ মাচ ডব্লুউএইচও করোনাকে বিশ্বমহামারী রূপে ঘোষণা করে দিয়েছিল। ১২ মার্চ ভারতে প্রথম করোনায় সংক্রমিত মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। এরপর কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকার সতর্ক হয়ে গিয়েছিল এবং ভারতের বিজ্ঞানীরা ও

চিকিৎসকরা করোনা ভাইরাসের চিহ্নিতকরণে সফল হলো। ১৭ মার্চ ভারত সরকার নিজ ল্যাবরেটরিতে করোনা ভাইরাসের পরীক্ষার অনুমতি দিয়ে দিল। ২২ মার্চ ২০২০-তে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জনতা কার্ফুর ডাক দিলেন যেটা এক ধরনের লকডাউন পূর্ব প্রস্তুতির মহড়া হয়েছিল। ২৫ মার্চ প্রধানমন্ত্রী মোদীজী দেশবাসীর উদ্দেশে অভিভাষণে রাত ১২টা থেকে ২১ দিন পূর্ণ লকডাউনের ঘোষণা করলেন।

২৮ মার্চ ভারতে প্রথম এক হাজার জন করোনা সংক্রমিত পাওয়া গেল। ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত ১০ হাজার এবং ১৯ মে আসতে আসতে করোনা সংক্রমণের সংখ্যা এক লক্ষ পার হয়ে গেল। ১৪ এপ্রিল লকডাউন ৩ মে পর্যন্ত বাড়ানোর ঘোষণা করা হলো। ২০ এপ্রিল দেশে প্লাজমা থেরাপির দ্বারা করেনা নিরাময়ের প্রথম ঘটনা ঘটলো। ১ মে প্রধানমন্ত্রী লকডাউন ১৭ মে পর্যন্ত বাড়ানোর ঘোষণা করলেন মে মাসেই আইসিএমআর ভারতের বায়োটেক কোম্পানির সঙ্গে সহযোগিতায় করোনা ভ্যাক্সিন তৈরির ঘোষণা করলো। ১ জুন লকডাউন থেকে বেরিয়ে এসে ভারত সরকার আনলক-১-এর দিশানির্দেশ ঘোষণা করলো।

১০ জুন ভারতে প্রথম করোনা সংক্রমিতদের সুস্থ হওয়ার সংখ্যার করোনা সংক্রমিতদের সংখ্যার থেকে বেশি হয়ে গেল। ২৬ জুন ভারতে সংক্রমণের সংখ্যা ৫ লক্ষ এবং ১৬ জুলাই ১০ লক্ষ পার করে গেল। ১ জুলাই ভারত সরকার আনলক-২-এর দিশানির্দেশ জারি করলো ৬ জুলাই ভারত বিশ্বে সংখ্যার তৃতীয় বৃহত্তর করোনা আক্রান্ত দেশ হয়ে গেল। ১৫ জুলাই ভারত বায়োটেকের দেশে তৈরি 'কোভ্যাকসিন' ভ্যাকসিনের প্রথম দফার ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরু হলো।

৩ আগস্ট সিরাম ইনস্টিটিউট অব

ইন্ডিয়াকে ডিসিজিআই থেকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফার ট্রায়ল করার অনুমতি দেওয়া হলো। ২৬ আগস্ট সিরাম ইনস্টিটিউট নিজের তৈরি ভ্যাকসিন 'কোভিশিল্ডের' ভারতে ট্রায়াল শুরু করলো। সেপ্টেম্বরে ভরতে করোনা প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি ছিল, দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা এই মাসে এক লক্ষ করে হচ্ছিল। ১৬ সেপ্টেম্বর ভারতে করোনা সংক্রমণের সংখ্যা এক কোটি অতিক্রম করে গেল। ২ জানুয়ারি ২০২১ ভারতের ড্রাগ কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট সিরাম ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ার ভ্যাকসিন কোভিল্ডিকে জরুরি ভিত্তিতে স্বীকৃতি দিল। ৩ জানুয়ারি ভারত বায়োটিক এবং আইসিএমআর-এর ভ্যাকসিন কোভ্যাকসিন-কে জরুরিকালীন ক্ষেত্রে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হলো।

আর্থিক প্যাকেজের ঘোষণা :

করোনা সংকটকালে অর্থব্যবস্থাকে চাঙ্গা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীর পক্ষ থেকে ২০ লক্ষ কোটি আর্থিক প্যাকেজের ঘোষণা করা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী একে করোনাকালে ঝিমিয়ে পড়া অর্থব্যবস্থার জন্য মিনি বাজেট আখ্যা দিয়েছিলেন। অর্থব্যবস্থাকে মজবুত করতে এবং দেশবাসীদের ধার এবং তাদের মাসিক কিস্তির উৎকণ্ঠাকে কম করতে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কও বড়ো ছাড়ের ঘোষণা করেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যেখানে সুদের উপর ঐতিহাসিক ছাড় দিয়েছে, সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি থেকে রিটেল লোকের ইএমআই শোধ করার ব্যাপারে তিন মাসের মোরেটোরিয়াম দিয়েছে। আরবিআই হোমলোন, কার লোন এবং অন্যসব লোনের ইএমআই শোধের উপর ছাড় দিয়েছে। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের মতে লকডাউনের কারণে প্রধানমন্ত্রী কিষান ফান্ডে ১৮৭০০ কোটি স্থানান্তর করা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনায় ৬৪০০ কোটি ছাড় দেওয়া হয়েছে।

কৃষিতে মার্চ থেকে এপ্রিলের মধ্যে ৮৬০০০ কোটি টাকার মধ্যে ৬৩ লক্ষ লোন মঞ্জুর করা হয়েছে। আবাস যোজনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্রেডিট লিঙ্কড সাবসিডি স্কিমের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে গৃহনির্মাণ ক্ষেত্রে ৭০০০০ কোটি টাকার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। মাইক্রো ফুড এন্টারপ্রাইজের জন্য ১০,০০০ কোটির স্কিম আনা হয়েছে।

প্রবাসী মজদুরের জন্য সরকারের সদর্থক পদক্ষেপ :

কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রালয় এবং শ্রমমন্ত্রালয় রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ১১ এপ্রিল পর্যন্ত সমস্ত প্রবাসী মজদুরের 'ডাটা চিপ' লেবার কমিশনের (সিএলসি) কাছে দিতে অনুরোধ করেছে। ডাটা বেস থেকে জানা যাবে যে এই মজদুরদের প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার জন্য খোলা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অথবা অন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, এই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী উজ্জলা যোজনার আধার নম্বরের মাধ্যমে বিনাপয়সায় গ্যাস সিলিন্ডারে লাভবান হচ্ছে কিনা?

২৫ মার্চ থেকে দেশজুড়ে ২১ দিনের লকডাউন করা হয়েছে। প্রবাসী মজদুররা শহর ছেড়ে নিজের নামে ফিরতে লেগেছিল। উদ্যোগগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদের কাছে ঘরের ভাড়া মেটানোর সঙ্গে অন্য আবশ্যিক চাহিদা পূরণের উপায়ও ছিল না এবং এই সঙ্গে স্বাস্থ্য সম্পর্কের মোকাবিলাও ছিল। ৫ থেকে ৬ লক্ষ মজদুর পায়ে হেঁটে ঘরে ফিরেছে কারণ পরিবহণ ব্যবস্থাও বন্ধ ছিল। দেশের রাজ্য সরকারের দ্বারা নির্মিত 'সেলটার হোমে' শত শত মজদুররা থেকেছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী ৩০ জুন দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণে জানিয়েছেন। যে নভেম্বরের মধ্যে দেশে প্রায় ৪০ কোটি গরিবের প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার সুফল পাবে যার সম্পূর্ণ খরচ কেন্দ্র সরকার দেবে এবং আনাজপাতি রাজ্য সরকার দ্বারা করা হবে। প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার অধীনে সমস্ত গরিব পরিবারকে যাদের রেশনকার্ড আছে এবং যাদের রেশন কার্ড নেই তাদের জনপ্রতি ৫ কেজি করে গম/চাল এবং এককিলো ছোলা এপ্রিলমাস থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে। এই বিনামূল্যের খাদ্যসামগ্রী রেশন কার্ডে প্রাপ্ত খাদ্যসামগ্রী থেকে অতিরিক্ত দেওয়া হয়েছে। দেশের সমস্ত রাজ্যেই নিজের ক্ষেত্রের সমস্ত প্রবাসী শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্র সরকারের খাদ্যান্ন যোজনাকে গুরুত্ব সহকারে পরিচালনা করা হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশ সরকার শহরের ৪ লক্ষ ৮১ হাজার ফুটপাতবাসী ছাড়া, ১১ লক্ষের থেকেও বেশি মজদুরকে এক হাজার টাকা করে দিয়েছে। ২০ লক্ষ নির্মাণ শ্রমিকদেরও টাকা দেওয়া হয়েছে।

লকডাউনের সঙ্গে সঙ্গে মাস্ক, স্যানিটাইজার, করোনা পরীক্ষার দ্রুততা, পিপিই কিট এবং এক্ষেত্রে সদিচ্ছা, উৎসাহ এবং প্রসন্নতায় স্বাবলম্বী, আত্মবিশ্বাসী এবং স্বদেশি আবিষ্কারের দ্বারা করোনা মুক্ত ভারতের সংকল্প নিয়ে 'সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ' ভাবনাকে সার্থক সিদ্ধ করার সঙ্গে বিশ্বজুড়ে দেশি ভ্যাকসিন সরবরাহ করার গৌরবপূর্ণ ইতিহাস ভারত গড়ে তুলেছে।

সঠিক সময়ে লকডাউন :

ভারত ঠিক এক বছর আগে করোনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে আদেশনামা জারি করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভাষায়, 'ভারতের মতো বিশাল জনসংখ্যার দেশে বিভিন্ন রকমের আশঙ্কার সম্ভাবনা ভাবা হয়েছিল। অন্যদেশের মহামারীর ভয়াবহতা দেখে জনগণের জীবন রক্ষায় লকডাউন করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না।' সংখ্যার দিক থেকে দেখলে লকডাউনের ফলে মাত্র ৬৩ লক্ষ করোনা সংক্রমণের কেস এবং প্রায় ৯৮ হাজার মৃত্যু সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত হয়েছে। সুতরাং অনুমান করা হচ্ছে যে যদি লকডাউন না করা হতো তবে আরও এক কোটি ৪০ লক্ষ সংক্রমণের কেস এবং ২৬ লক্ষের মতো বেশি মৃত্যু জুন ২০২০-র মধ্যেই ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির বিশেষ ভূমিকা :

করোনা সংক্রমণ এবং এর ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে লকডাউনের মতো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দেশের মঠ মন্দিরগুলি, আশ্রম এবং গুরুদ্বারাগুলি থেকে প্রধানমন্ত্রী ফান্ডে নগদ অর্থদানের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাসী মজদুরের জন্য ভোজন, ওষুধপত্র, জামাকাপড় এবং অন্য জিনিসপত্র আবশ্যকতা পূরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

মন্দির ও গুরুদ্বারাগুলিতে হাজার হাজার লোকেদের বিনামূল্যে ভোজনের ভাণ্ডার ও লঙ্গরখানা মাসাধিককাল জুড়ে করা হয়েছে। ভোজন ইত্যাদি কল্যাণমূলক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে প্রবাসী শ্রমিকদেরও তাদের গ্রামে পৌঁছে দেওয়া, রক্তদান শিবির খোলা এবং প্লাজমা ডোনেট করার জন্য আভিযান চলেছে।

ধর্মীয় ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠান দেশের এই সংকটকালে সহযোগিতা করেছে। সোমনাথ মন্দির ট্রাস্ট গুজরাট, কাঞ্চী কামকোটি পীঠম

তামিলনাড়ু, মাতা বৈষ্ণোদেবী মন্দির জম্মু-কাশ্মীর, মহাকালেশ্বর মন্দির উজ্জয়ন, পতঞ্জলি যোগ ট্রাস্ট হরিদ্বার, মহামায়া মন্দির ট্রাস্ট বিলাসপুর ছত্রিশগড়, শ্রী নিত্য চিন্তাহরণ গণপতি মন্দির ট্রাস্ট রতলাম মধ্যপ্রদেশ, সিদ্ধি বিনায়ক মন্দির মুম্বই, দিল্লির ঝন্ডেওয়ালামাতা মন্দির, গুরুদ্বারা রকারগঞ্জসাহেব ইত্যাদি অগণিত ধর্মীয় ট্রাস্ট, মন্দির এবং প্রতিষ্ঠানগুলি, যারা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রিলিফ ফান্ডে যথেষ্ট পরিমাণে দান করেছে।

আমেরিকার পর সবচেয়ে বেশি করোনা পরীক্ষায় ভারতে :

আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত দেশে প্রতিদিন প্রায় ৫ লক্ষ পরীক্ষা করা হচ্ছিল যা নভেম্বর পর্যন্ত দৈনিক ১০ লক্ষ এবং এখন দৈনিক ১২ লক্ষ পরীক্ষার থেকেও বেশি সংখ্যায় দাঁড়িয়েছে।

স্বদেশি আত্মনির্ভর টিকার আবিষ্কার :

দেশে করেনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন 'কোভিশিল্ড' সেরাম ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড এবং 'কোভ্যাক্সিন' ভারত বায়োটেক এবং আইসিএমআর দ্বারা ভারতেই তৈরি হয়ে গেছে। করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একদিকে বিশ্বের সমস্ত দেশ অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল কিন্তু ভারত দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ জনসংখ্যার দেশ হওয়া সত্ত্বেও নিজের ক্ষমতায় টিকাকরণ অভিযানের শুরু করার ক্ষেত্রে সফল। করোনা সংকটকালে আমেরিকা-সহ ১৫০ টি দেশগুলিকে ভারত দ্বারা সরবরাহকৃত হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন কার্যকরী প্রমাণিত হয়েছে। এই জন্য ভ্যাক্সিনের জন্য বিশ্ব ভরসা করে আছে।

এই সংকটকালের ফাঁকে খুঁজতে আত্মনির্ভর ভারতের বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি দিতে আত্মবিশ্বাসী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্যে প্রকট হতে দেখা যাচ্ছে— 'করোনার সঙ্গে লড়াই আমাদের আত্মবিশ্বাস এবং আত্মনির্ভরতার উপর প্রতিষ্ঠিত। আজ আমরা মাস্ক, পিপিই কিট, টেস্টিং কিট, ভেন্টিলেটরের নির্মাণে আত্মনির্ভর হয়ে গেছে এবং রূপান্তরিত করছে। এই মনোবলকে আমাদের টিকাকরণের ক্ষেত্রেও দৃঢ়তা দেখাতে হবে।' করোনা টিকাকরণের উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, 'এই ভারতের সামর্থ্য দেখাচ্ছে ভারত শুরুতেই যতজন লোককে টিকা দেওয়া হয়েছে যা অন্য অনেক দেশের জনসংখ্যার থেকেও বেশি।

টিকাকরণের প্রথম দফার করোনা যুদ্ধ :

প্রথম দফাতেই তিন কোটি স্বাস্থ্যকর্মী, সাফাইকর্মী এবং সুরক্ষাকর্মীদের বিনামূল্যে টিকা দেওয়া হবে। অন্যদিকে বিশ্বজুড়ে ১০০টি দেশের জনসংখ্যা তিন কোটির থেকেও কম ৫০ বছর বয়েসের বেশি এবং গুরুত্বপূর্ণ/ জটিল রোগগ্রস্ত লোকেদের যুক্ত করলে আগামী কয়েকমাসের মধ্যে ৩০ কোটি লোকেদের অগ্রাধিকারের সঙ্গে টিকা দেওয়া হবে। বাস্তবে আনুমানিক সংখ্যার উপর দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় সেক্ষেত্রে ১৬ জানুয়ারি থেকে টিকাকরণ শুরুর প্রথম দফায় তিন কোটি করোনা যোদ্ধাদের চিহ্নিত করা হয়েছে যার মধ্যে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং সুরক্ষার সঙ্গে যুক্ত অগ্রসারির যোদ্ধারা শামিল করা হয়েছে। আনুমানিক সরকারি এবং প্রাইভেট ক্ষেত্র মিলিয়ে দেশে প্রায় ৭০ লক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছে। যার মধ্যে ১১ লক্ষ চিকিৎসক, ৪ লক্ষ আয়ুশ প্র্যাকটিশনার, ১৫ লক্ষ নার্স, ১০ লক্ষ এএনএম এবং আশা কার্যকর্তা এবং এছাড়া সাফাইকর্মী এবং দ্বিতীয় কর্মচারীরাও যুক্ত রয়েছে। পুলিশকর্মীদের সংখ্যা ৪৫ লক্ষ এবং জওয়ানদের সংখ্যা ১৫ লক্ষের কাছাকাছি। সার্বজনীন সেবা, সমুদায়সেবা যার মধ্যে শিক্ষক, সার্বজনীন পরিবহণের ড্রাইভার, কন্ডাক্টার এবং ক্লিনার ইত্যাদিযুক্ত করতে হয় সংখ্যায় যারা প্রায় ১.৫ কোটির বেশি। প্রথম দফার টিকাকরণে ৫০ বছর বয়েসর বেশি বয়স্কদের সমস্ত নাগরিকও যুক্ত রয়েছে যারা মারাত্মক অথবা অসাধ্য রোগগ্রস্ত, দেশে এই প্রকার লোকেদের আনুমানিক সংখ্যা ২৬ কোটির কাছাকাছি হবে।

বিশ্ব স্বীকার করে নিয়েছে ভারতের লৌহদৃঢ়তা :

সংযুক্ত রাষ্ট্রের মহাসচিবের এন্টোনিয়ো গুতারেশ করোনা ভ্যাকসিন উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতের প্রশংসা করার সময় বলেছেন, 'ভারতের ভ্যাকসিন উৎপাদন ক্ষমতা বিশ্বের মধ্যে সর্বোত্তম। আমি আশা করি যে বিশ্ব যেন উপলব্ধি করে এর পরিপূর্ণ উপযোগিতা গ্রহণ করা উচিত। আমার বিশ্বাস যে ভারতের টিকাকরণ সার্বিক অংশগ্রহণ থাকবে। ভারতের কাছে সমস্ত রকমের ব্যবস্থা রয়েছে এবং বিশ্বের টিকাকরণেও এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হবে। এই উদ্যোগের দ্বারা বিশ্বজুড়ে টিকাকরণ অভিযান সফল হয়ে উঠবে।'

টীকাকরণেও অগ্রণী :

ভারতে টিকাকরণ অভিযানের শুরু ১৬ জানুয়ারি হয়েছে। ভারতে দেশ্যবাপী কোভিড-১৯ টীকাকরণ কাজকর্মের জন্য কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে টিকা লাগানোর স্বাস্থ্যকর্মীদের সংখ্যার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। কোভিড-১৯-এর টিকা দেওয়ার স্বাস্থ্যকর্মীদের মোট সংখ্যা ২৯ জানুয়ারি ৩৩ লক্ষ পার করে গিয়েছিল, ৬২৯৩৯টি প্রকল্পের মাধ্যমে কোভিড-১৯ টিকা দেওয়া স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা মোট ৩৩,৬৮,৭৩৮-এ পৌঁছেছে। অন্যদেশে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই টিকাকরণ করে আসছে, ভারত মাত্র ছয়দিনে ১০ লক্ষ জনকে ভ্যাকসিন দিয়ে ফেলেছে যেখানে এই সংখ্যক লোকেদের ভ্যাকসিন দিতে আমেরিকায় ১০ দিন, স্পেনের ১২ দিন, ইজরায়েলের ১৪ দিন, ব্রিটেনের ১৮ দিন, ইতালিতে ১৯ দিন, জার্মানিতে ২০ দিন এবং ইউইএতে ২৭ দিন লেগেছে। ভ্যাকসিনের অর্ডার করা হয়েছে। দুনিয়ার ৯২টি দেশ থেকে মেড ইন ইন্ডিয়া ভ্যাকসিন নিতে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, এর ফলে ভ্যাকসিন হাব রূপে ভারতের পরিচয় আরও মজবুত হয়ে উঠেছে।

করোনামুক্ত ভারতের দিকে পদক্ষেপ :

এক বছরের মধ্যে ভারত বিশ্ব করোনা ভাইরাস বিষয়ে এবং মৃতের সংখ্যার দৃষ্টিতে চতুর্থ স্থানে, করোনা ভাইরাসে ১,৫৪,০১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। করোনা মৃত্যুতে সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে ভারত তৃতীয় স্থানে।

ভারতের সংবেদনশীল সরকার, সচেতন সমাজ ও করোনা যোদ্ধারা, বৈজ্ঞানিকগণ ও আত্মনির্ভর ভারতের আত্মবিশ্বাস এবং প্রস্তুত করার ক্ষমতার সামগ্রিক উদ্যোগের জন্য ভারতকে করোনা মুক্ত করার সংকল্প থেকে সফলতার স্তর পর্যন্ত পৌঁছাতে দেখা যাচ্ছে। সবকিছুর যোগফলে এটা অবশ্যই বলা যায় যে ভারত সচেতন, সক্রিয় এবং সহবেদনশীল সরকারের সঙ্গে এখানকার সেবা মনোভাবী সমাজের শক্তিতে করোনাকালেও নিজেদের যোগ্য এবং সমর্পিত করোনা যোদ্ধাদের ক্ষমতায় দেশকে বিশ্বস্তরে আত্মনির্ভর ভারতের গৌরবময় ছবি তুলে ধরেছে।

(লেখক টাটা অ্যান্ড সন্সের চেয়ারম্যান)

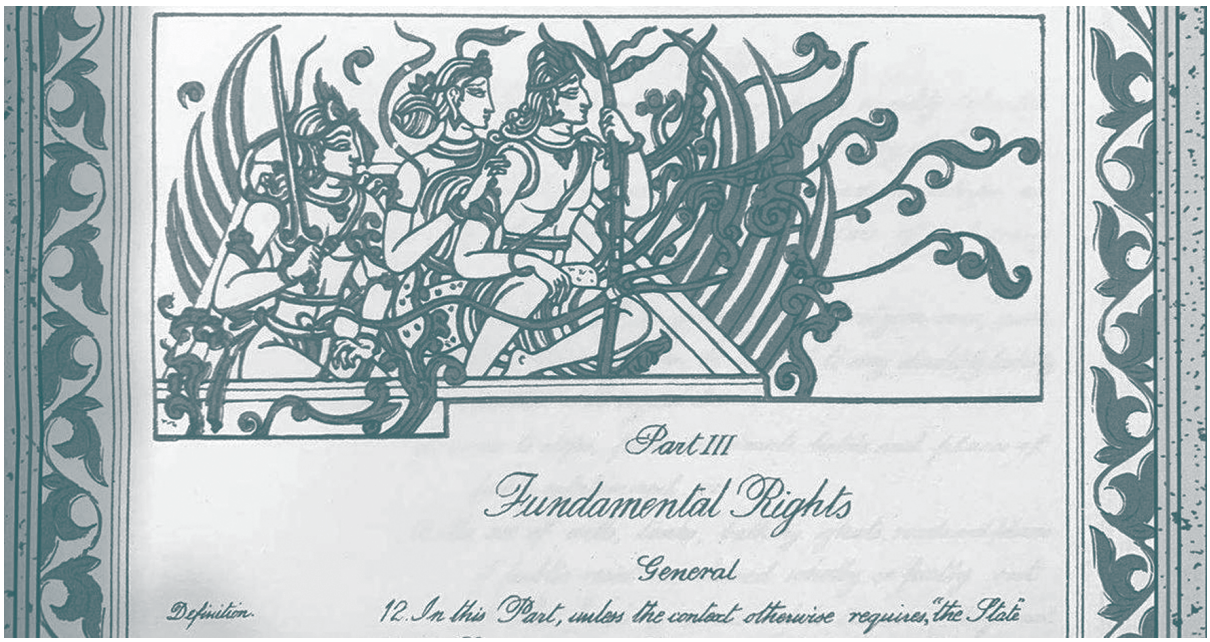

শ্রীরামচন্দ্রের চিত্র সংবিধানকে জীবন্ত করে তুলেছে

অজয় সরকার

সংবিধান সভার মোট ২৯৯ জন সদস্যের মধ্যে ২৮৪ জন সদস্যের উপস্থিতিতে এবং তাঁদের স্বাক্ষর করা সম্মতিতে ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতের সংবিধান গৃহীত হয়। নাগরিকত্ব ও নির্বাচন-সমেত সংবিধানের কিছু কিছু অংশ এই দিন থেকেই লাগু হয়। তবে সংবিধানের প্রধান প্রধান অংশসমূহ ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে লাগু হয় সেজন্য ২৬ জানুয়ারিকে ভারতের গণতন্ত্র দিবস হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে।

সংবিধানের চূড়ান্ত খসড়া গৃহীত হওয়ার পর, লিখিত সংবিধানের চেহারা কেমন হবে, তা নিয়ে সংবিধান প্রণেতাদের মধ্যে বেশ শলা পরামর্শ চলে। সংবিধান প্রণেতারা সবাই একমত হন যে সংবিধানের প্রতিটি অধ্যায়ের সুচনা হবে ভারতীয় জীবন সংস্কৃতির পরিচয় জ্ঞাপক এক আলেখ্য দিয়ে। প্রতিটি ভারতীয় যেন এই পবিত্র সংবিধানে খুঁজে পায় পূর্বপুরুষদের গৌরবগাথাকে ও মহান পরম্পরাকে। এই মহান কাজে দেশের বরেণ্য শিল্পীদের ডাক পড়লো এবং তারা সানন্দে গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়ে কাজে লেগে পড়লেন। সংবিধানের ক্যালিগ্রাফি বা হাতে লেখার গুরুদায়িত্ব পালন করলেন প্রেমবেহারী নারাইন রায়জাদা। সংবিধানের মূল সংস্করণকে নিপুণ শিল্পকলার সৌন্দর্যে ভরিয়ে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হলো শান্তিনিকেতনের জগদ্‌বন্দিত শিল্পী নন্দলাল বসুর উপর। হাতে লেখা সংবিধানের একটি অধ্যায় শেষ হওয়ার পরে এবং পরবর্তী অধ্যায় শুরু হওয়ার আগে অতীত ভারতের বিভিন্ন চিত্র, ঋষিমুনিদের ছবি, অনেক পৌরাণিক চরিত্রের সুনিপুণভাবে অঙ্কন করা হলো। এর মাধ্যমে শিল্পীরা আমাদের এটা স্মরণ করিয়ে দিতে চাইলেন যা সংবিধান প্রণেতারা লেখনীতে প্রকাশ করতে পারেননি। তাদের সঙ্গতভাবেই মনে হয়েছিল যে শিল্পকলা শব্দ বা লেখনীর চেয়ে অনেক বেশি বাঙ্ময়। তারা বিচক্ষণ পণ্ডিত, ভুল করেননি।

সংবিধানের তৃতীয় পর্যায়ের বিষয়বস্তু হলো সরকার কর্তৃক নাগরিকদের প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহ। ভারতের সংবিধানে এই অংশটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই অংশ সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নাগরিকদের রক্ষাকবচের কাজ করে। সংবিধানের এই অংশটি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণেই এই অধ্যায়ের সূচনাপর্বে সংবিধান প্রণেতাদের সম্মতিক্রমে মহান শিল্পীরা শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষ্মণের ছবিকে স্থান দিয়েছেন। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে দীর্ঘ ৮০০ বছর ধরে ভারতীয়রা

ছিলেন প্রকৃত অর্থে পরাধীন। শাসনের নামে ভারতীয়দের যেমন অবর্ণনীয়ভাবে বর্বরতায় নিষ্পেষিত হতে হয়েছে, ঠিক তেমনি তার নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতিকে ধূর্ততার সঙ্গে ভুলিয়ে দেওয়ার অনবরত চেষ্টা হয়েছে। সংবিধান প্রণেতারা এই নির্মম সত্যকে সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন।

তাই, তারা সংবিধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশের প্রারম্ভে শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষ্মণের চিত্র এঁকে যেন বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া ভারতীয় সমাজকে তার প্রাচীন গৌরবগাথাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন।

এই গৌরবগাথা কী?

এক কথায়, উত্তর হলো রামরাজ্য। রামরাজ্য বলতে আমরা এক আদর্শ শাসন ব্যবস্থাকে বুঝি। সংবিধান প্রণেতারা সংবিধানের মধ্য দিয়ে এক আদর্শ শাসন ব্যবস্থা আমাদের উপহার দিতে চেয়েছিলেন। দু' একটা উদাহরণের মধ্য দিয়ে আমরা এই আদর্শ শাসন ব্যবস্থাকে বুঝার চেষ্টা করবো।

ভারতের সংবিধানের ১৪ নং ধারায় সমানাধিকারের বলা আছে। এই ধারার মূল কথা হলো, 'Equality before law and Equal Protection of Laws'। নিঃসন্দেহে নাগরিক অধিকার রক্ষায় এই সাংবিধানিক রক্ষাকবচ আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এক কথায়, ভারতীয় সংবিধানের ১৪নং ধারাটি হলো মৌলিক অধিকারসমূহের মর্মবাণী। সংবিধানের তৃতীয় পরিচ্ছদের প্রারম্ভে শ্রীরামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের চিত্রের উপস্থিতির মধ্যে এক আদর্শ শাসন ব্যবস্থার (রামরাজ্যের) প্রতীকায়িত রূপ আমাদের

শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষ্মণের চিত্র যেন সংবিধানের বাক্যবন্ধনীগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছে। আজ যারা 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে আপত্তি খুঁজে বেড়ান, তাঁরা কি সংবিধান প্রণেতাদের অজ্ঞ মনে করেন?

সামনে উপস্থাপন করা হলো। স্বাভাবিকভাবেই একটা কৌতূহল জাগে যে রামরাজ্যে জনসাধারণের স্বার্থে এই মৌলিক অধিকার সমূহ কীভাবে রক্ষিত হতো?

রামায়ণে আমরা নিষাধরাজের উল্লেখ পাই। নিষাধরাজ ছিলেন জাতিতে শূদ্র, জঙ্গলে বসবাসকারী বনবাসীদের রাজা। অথচ, ক্ষত্রিয়বীর শ্রীরামচন্দ্রের রাজকীয় কৌলিন্য নিষাধরাজের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হতে কোনো বাধা হয়নি। অপরাপর ক্ষত্রিয় রাজাদের যে সম্মান ও মর্যাদা শ্রীরামচন্দ্র দিয়েছেন, নিষাধরাজের ক্ষেত্রে তার সামান্যতম ব্যত্যয় হয়নি। মাতা শবরী এক অতি সাধারণ মহিলা যিনি বনবাসী শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর ভাষায় অস্পৃশ্য হরিজন। আমাদের মধ্যে যারা রাজনীতি করেন, তাদের কাছে শবরী হলেন 'ভোট ক্যাচার'। কিন্তু শবরীর মতো অতি নগণ্য মহিলার পদস্পর্শ করতে মহাপরাক্রমশালী অযোধ্যাপতির কোনো অসুবিধা হয়নি। মৃত্যুতেও সমাধিকারের আদর্শ থেকে শ্রীরামচন্দ্র বিচ্যুত হননি। লঙ্কাপতি রাবণ বা রাক্ষসী তাড়কা শ্রীরামচন্দ্রের কাছে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত হন। অথচ শ্রীরামচন্দ্র পরিপূর্ণ মর্যাদায় তাদের দেহের পার্থিব সৎকার করেন। শুধু কি রাবণ বা তাড়কার দেহ সৎকার? প্রতিটি শত্রুসেনার অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করার সময় শ্রীরামচন্দ্র সশরীরে উপস্থিত থেকেছেন। কারগিলের যুদ্ধে নিহত ক্যাপ্টেন সৌরভ কালিয়ার নশ্বর দেহ তার পরিবার ফিরে পেয়েছিল বটে, কিন্তু তার দেহের এমন কোনো অংশ ছিল না যেখানে পাকিস্তানিরা বর্বরতার চিহ্ন এঁকে দেয়নি। অপরপক্ষে, যেসব পাকিস্তানি সেনা যুদ্ধে নিহত হয়েছিল, তাদের জন্য ইমাম ডেকে যথাযোগ্য মর্যাদায় তাদের অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছিল। আমাদের সেনাদের মধ্যে এই উন্নত মানবিকতাবোধের এবং মূল্যবোধের উৎস কী? উত্তর হলো ভারতীয় জীবনের সংস্কার যা এই দেশের মানুষ মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের কর্মজীবন থেকে আহরণ করেছে। যখন শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক হয়, তখন শ্রীরামচন্দ্র তার পিতৃদেব দশরথকে অযোধ্যা রাজ্য চার ভাইয়ের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়ার জন্য আবেদন করেন। নিজের জীবনে সমানাধিকারের এমন সার্থক প্রয়োগ যে শাসক করেছেন, সংবিধানে তার চিত্রপট ব্যবহার করে সংবিধান প্রণেতারা সংবিধানকে নিছক কিছু নির্দেশমূলক বাক্যবন্ধনীতে আটকে রাখেননি। শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষ্মণের চিত্র যেন সংবিধানের বাক্যবন্ধনীগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছে। আজ যারা 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে আপত্তি খুঁজে বেড়ান, তাঁরা কি সংবিধান প্রণেতাদের অজ্ঞ মনে করেন? □

বিজ্ঞপ্তি

সঞ্জয় নন্দী আরোগ্য কেন্দ্র

কেশব ভবন

৯এ, অভেদানন্দ রোড, মানিকতলা, কলকাতা-৬

করোনা মহামারীর কারণে ২০২০-র মার্চ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত কেশব ভবনে ডাঃ হেডগেওয়ার স্মারক সমিতি পরিচালিত সঞ্জয় নন্দী আরোগ্য কেন্দ্র বন্ধ রাখা হয়েছিল।

জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে, গত ১ ডিসেম্বর থেকে প্রতিদিন (রবিবার ছাড়া) আরোগ্য কেন্দ্র নিয়মিত ভাবে চালু রয়েছে।

অনুমত্যানুসারে
ডাঃ জয়দেব কুণ্ডু

নিজের ঘরের কৃষকদের বঞ্চনা করে, তিনি নাকি কৃষক দরদি?

বিশ্বপ্রিয় দাস

৩৪ বছরের বামেদের অপশাসনের অবসান ঘটিয়ে রাজ্যের মানুষ এনেছিল বর্তমান সরকারকে। অনেক আশা নিয়ে আপামর জনগণ তাকিয়ে ছিল বর্তমান সরকারের দিকে। তাঁরা এটাও ভেবেছিলেন, সব ক্ষেত্রে হয়তো কিছুটা হলেও তাঁদের জন্য ভাববেন নতুন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু দেখা গেল, বর্তমান সরকারের যিনি মুখ্যমন্ত্রী তিনি শাসক দলের সুপ্রিমোও বটে, তাঁর সবজান্তা, অবিবেচক আর স্বজনপোষণ মনোভাবের কারণে রাজ্যের মানুষের দুর্গতি একটা চরম সীমায় পৌঁছে গেল। বিশেষ করে তাঁর সরকার আনার পিছনে যাদের অবদান বেশি ছিল, সেই গ্রামের প্রান্তিক কৃষি ক্ষেত্রে কাজ করা মানুষগুলোর অবস্থার পরিবর্তন যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রয়ে গেল।

মুখ্যমন্ত্রী কয়েকদিন আগে একটি জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে রাজ্য সরকারের ধান সংগ্রহ ও সেটা থেকে চাল তৈরি করে সবাইকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার প্রসঙ্গে বলছিলেন। তিনি বলেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার যে চাল রাজ্যের জন্য পাঠায়, সেটি এফসিআইয়ের গোডাউনে থাকে। সেগুলি সব পচা। উনি কেজি পিছু ধান তৈরি করতে প্রায় ৩১ টাকা খরচ করেন। তাহলে সেই টাকা যদি সংগৃহীত ধানের সঙ্গে যোগ করা যায় তাহলে সাধারণ মানুষ যে চাল পান, সেটির দাম কত হতে পারে? বাজারে সাধারণ মিনিকিট চাল, বা নিদেন পক্ষে একটু ভালো চালের সমতুল্য হবে এই মূল্য। ফলে বুঝে নিন তিনি কতটা বিশেষজ্ঞ।

তিনি নাকি কৃষকদের নিয়ে ভাবেন। ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার আগে ইস্তাহার প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে কৃষকদের জন্য এক গুচ্ছ কথা বলা হয়েছিল। যেমন, কৃষির উন্নয়নে উন্নত মানের কৃষি প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে সাহায্য করবে। ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী কৃষির প্রচলন হবে, উন্নততর শস্য মিশ্রণ হবে। ধানের উৎপাদনের মাত্রা পঞ্জাব ও কর্ণাটকের সমান বৃদ্ধি ঘটাতে হবে।

গ্রামীণ অর্থনীতিকে উৎসাহ জোগাতে কৃষি উৎপাদন পরিসঙ্গত ভাবে বৃদ্ধি ঘটাতে হবে। আদতে সেই কথাগুলি যে কত ভুয়ো ছিল সেটা গত প্রায় দশ বছরে প্রমাণিত হয়েছে।

গত একবছর ধরে আমাদের রাজ্যে আলুর মূল্য বৃদ্ধি বা চালের দাম বৃদ্ধি চোখে পড়ার মতো। অন্যদিকে ওই ইস্তাহারে বলা ছিল, রাজ্যের ধান ও আলুর জমির উর্বরতা বাড়িয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করে মজুত এতটাই বৃদ্ধি করা হবে, যাতে সারা বছর আলুর জোগান ঠিক থাকে। অন্যদিকে কৃষকরও যেন তাঁদের প্রাপ্য মূল্য একেবারে ঠিকঠাক পান। কিন্তু তিনি গত প্রায় দশ বছরে ফড়েরাজ যেমন বন্ধ করতে পারেননি, তেমনি এই দুটি ক্ষেত্রে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে যেমন ধানের সংগ্রহে বৈষম্য দূর করতে পারেননি, তেমনি পারেননি আলুর বন্ড বিক্রেতাদের মুনাফা লোটার জন্য কালোবাজারি রুখতে। ফলে কৃষকদের অবস্থা তথৈবচঃ। ওই ইস্তাহারে ছিল রাজ্যে অনেক সরকারি কোল্ড স্টোরেজ তৈরি হবে কৃষিজাত দ্রব্য সংরক্ষণে। গত প্রায় দশ বছরে কটি কোল্ড স্টোরেজ হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী সেই হিসেব দেবেন কি? ছোটো ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য তিনি নাকি মালিকানার বিষয়টি নিয়ে ভাববেন, আদতে কতটা ভেবেছেন মাননীয়া? ভাগচাষিদের জন্য সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সরকার করবে, তাঁর কি হলো মুখ্যমন্ত্রী আপনার শাসনকালে? তাও তো জিজ্ঞেস করছি না, অসম্পূর্ণ ভূমি সংস্কারের কথা বলেছিলেন, সেটার কতটা এগোল? সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করবেন বলেছিলেন, সেটার গতি প্রকৃতি কী? স্থানীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির কথা বলেছিলেন, সেই উন্নয়নের হাল কীরকম? কৃষকদের জন্য ভূমি মানচিত্র বা ভূমি ব্যাঙ্ক, সেট কী অবস্থায়?

এরকম বহু প্রশ্ন আসবে। আপনি নাকি কৃষকদের খুব কাছের, আদতে নিজেই কৃষকদের জন্য কিছুই করেননি আপনার শাসনকালে। সেটা প্রমাণিত সত্য। অনেকটা সেই নিজের দিকে না তাকিয়ে, অন্যের দোষ ধরে। ◻

এবারের বাজেট নিঃসন্দেহে সাহসী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন

কুণাল চট্টোপাধ্যায়

দেশের অর্থমন্ত্রী ১ ফেব্রুয়ারি সংসদে ২০২১-২২ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করলেন। অনেকে নানা কারণ দেখিয়ে এই অধিবেশনে নিঃসন্দেহে এক সাহসী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বাজেট বলা যায়।

গত ২০২০-২১ অর্থবর্ষে দেশে ৬.৪০ কোটি লোক আয়কর জনিত ফাইল নথিভুক্ত

অংশ নেয়নি এবং প্রত্যাশিত ভাবেই বাজেটের সমালোচনা করে একে দিশাহীন, জনবিরোধী প্রভৃতি বহুব্যবহৃত বিশেষণে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রকাশ কারাতরা কখনোই চালকের আসনে বসতে সাহস না করে চিরবিরোধী ভূমিকায় থাকতে পছন্দ করেন সেটা আমাদের জানা। তাই প্রাক্তন বিত্তমন্ত্রী পি চিদাম্বরমের এই বাজেটের বিরোধিতা অবাক করার মতো। এই বছরের বাজেট এমন এক পরিস্থিতিতে পেশ করা হলো যখন কোভিড জনিত কারণে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে আমাদের দেশও এক অভূতপূর্ব সংকটের সম্মুখীন। এমনিতেই অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নোটবন্দি, জিএসটির মতো পদক্ষেপগুলির কারণে অর্থনীতির বিকাশ ব্যাহত, তারপর কোভিড জনিত প্রতিবন্ধকতা আমাদের মতো মধ্য আয়ের দ্রুত বিকাশশীল গণতান্ত্রিক অর্থনীতির কাছে বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে উপস্থিত হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই বাজেটকে করেছে। একশো শতাংশের বেশি এই ট্যাক্স ফিলার-এর সংখ্যাবৃদ্ধি এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য। সরকার যদি এই অগ্রগতি আগামীদিনে ধরে রাখতে পারে তাহলে ভবিষ্যতের বাজেটগুলিতে জনগণের উপর করের চাপ কমবে আশা করাই যায়।

দেশের একাংশে কৃষক অসন্তোষের বিষয়টি যদি বাদও দিই, ক্রমবর্ধমান বেকারি ও বৈষম্য, জনস্বাস্থ্যের দুর্বলতার মতো জরুরি চাহিদাগুলির বিচারে অনেকে ভেবেছিল আর্থিক অনুমোদন অনেক বাড়বে। বরং ঘটল উলটোটা। ভাবা গিয়েছিল রাজস্ব ঘাটতি জাতীয় আয়ের ৮.৫ শতাংশ হতে পারে। নির্মলা সীতারামনের বাজেট তাকে ৬.৮ শতাংশে রেখেছে। এই হারে লাগাম ধরে রাখতে পারলে ৫ ট্রিলিয়ন জিডিপির লক্ষ্যে ২০২৫-২৬-এ জিডিপি-র চার শতাংশে তাকে নামানো যেতে পারে বলে অনেকের অনুমান। তাই তিনি কোনো জনচিত্তজয়ের লক্ষ্যে একটা কঠিন বছর হওয়া সত্ত্বেও কোনো আয়কর রিলিফ দেননি। রয়েছে কৃষি সেস-এর প্রস্তাব।

আলোচ্য বাজেটে স্বাস্থ্য ও পরিকাঠামোর বিষয় দুটোকে বড়ো মাইলস্টোন হিসেবে চিহ্নিত হবে। জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ১৩৭ শতাংশ ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি, কেবল কোভিড মোকাবিলাতেই ৩৫০০০ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব প্রায় সকল পক্ষের সমর্থন পেয়েছে। এই লক্ষ্যে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ-কে বিশেষ উৎসাহের প্রস্তাব এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

বিত্তমন্ত্রীর এই 'ইনফ্রা রিচ' বাজেটে কেবল জাতীয় সড়ক খাতেই ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ধরা হয়েছে ১.৯৩ লক্ষ কোটি টাকা। রাজ্য বিধানসভার চিন্তা মাথায় রেখে তামিলনাড়ুর ৩৫০০০ কিলোমিটার সড়কের জন্য এক লক্ষ কোটি, কেরলের ১১০০ কিলোমিটারের জন্য ৬৫০০০ কোটি, পশ্চিমবঙ্গে ৬৭৫ কিলোমিটারের জন্য ২৫০০০ কোটি ও অসমের ১৩০০ কিলোমিটারের জন্য ৩৪০০০ কোটি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মৎস্য বন্দর ও নৌবন্দরগুলো গুরুত্ব পেয়েছে।

বাজেটের অন্য একটি বিষয় হলো মূলধনী ব্যয়ের ৩৪.৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি করে ৫.৫৪ লক্ষ কোটি টাকা করা। এই লক্ষ্যে ডেভলপমেন্ট ফিনান্সিং ইন্সটিটিউট গঠন এবং প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগে অংশগ্রহণের পরিমাণ ৪৯ শতাংশ থেকে ৭৫ শতাংশে তোলা কৌশলগতভাবে ইতিবাচক পদক্ষেপ। অবশ্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোকে ঋণদানে উৎসাহ জোগানোর জন্য ২০০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ কতটা উপযুক্ত সে প্রশ্ন থেকে যাবে। শাসক দলের নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নন কোর পাবলিক সেক্টর ইউনিটগুলো বিক্রি করে ১,৭৫০০০ কোটি টাকা আয় (যার মধ্যে দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ও একটি সরকারি বিমা সংস্থা) বিতর্কের অবকাশ রেখেছে।

দীর্ঘকালীন প্রকল্পগুলো যাতে অর্থাভাবের সম্মুখীন না হয় তার জন্য আইনগত নিশ্চয়তা ও পেশাদারি দক্ষতার সাহায্যে প্রস্তাবিত ডেভেলপমেন্ট ফাইনান্স ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে তিন বছরে পাঁচ লক্ষ কোটি টাকার সংস্থান হতে পারে। বাজেটে ৭৫ বছরের বেশি নাগরিকের পেনশন ও সুদের হিসেবে করদানের নথিভুক্তির থেকে মুক্তি অবশ্যই সরকারের কল্যাণকর ও মানবিক দিকটিকে প্রকাশ করেছে।

পঞ্জাবের কৃষক আন্দোলন খালিস্তান আন্দোলনেরই নামান্তর

সুজিত রায়

১৯৭৩ সালের ১৬ ও ১৭ অক্টোবর পঞ্জাবের আনন্দপুর সাহিব গুরুদোয়ারায় আকালি দলের ওয়ার্কিং কমিটি যখন 'পঞ্জাবের স্বার্থে' ১২ দফা দাবি সংবলিত আনন্দপুর সাহিব প্রস্তাব গ্রহণ করল সেদিনই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মহল বুঝে গিয়েছিল, ওই প্রস্তাবের মূল সুর গ্রেটার অটোনমি বা বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসন যেটি আকারে ইঙ্গিতে ভাষার চাতুর্যে স্পষ্ট করে দিয়েছিল, ওই প্রস্তাব ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর রাজনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। একই সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক এবং প্রশাসন ক্ষেত্রে একটা শোরগোল উঠে গিয়েছিল ওই প্রস্তাবকে ঘিরে যে স্বাধীনতার পর এই প্রথম স্বাধীন ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য প্রায় পৃথকত্বের দাবিতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ পরিবারের কাঠামোটি ভাঙতে চাইছে। চাইছে পৃথক প্রশাসন, পৃথক আইন, পৃথক পরিকাঠামো এমনকী নিজস্ব স্বাধীন পতাকা।

তুখোড় রাজনীতিবিদ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সেদিন পঞ্জাবের দুরভিসন্ধি বিশ্লেষণ করে বুঝে গিয়েছিলেন— আনন্দপুর সাহিব প্রস্তাবের পিছনে রয়েছে প্রতিবেশী পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ মদত। অতএব এমন একটা অযৌক্তি দাবিকে প্রায় জন্মকালেই গলা টিপে মেরে ফেলার উদ্যোগ নিতেই তিনি একটি চরিত্রকে ভারতীয় রাজনীতির আঙিনায় প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। তার নাম জার্নেল সিংহ ভিন্দ্রানওয়ালে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাবর্ষেই পঞ্জাবের মোগা শহরের কাছেই রোদে গ্রামে জন্ম নেওয়া ওই যুবকটি সেনাবাহিনীর জেনারেল হতে পারেননি। হয়েছিলেন ধর্মীয় সংস্থা দমদমি টাঁকশালের ধর্মীয় প্রচারক। তৎকালীন পঞ্জাবের কংগ্রেস প্রধান জ্ঞানী জৈল সিংহ এবং নিজ কনিষ্ঠ পুত্র সঞ্জয় সিংহের পরামর্শে ইন্দিরা গান্ধী ওই কাঁধের বেল্টে ঝোলানো তরোয়াল, রাইফেল, কোমরে রিভলবর এবং বুকে আড়াআড়িভাবে ঝোলানো বুলেটের বেল্ট বহনকারী ধর্মপ্রচারককে তুরুপের তাস বানিয়ে দিলেন। চেয়েছিলেন বিষ দিয়ে বিষদাঁত উপড়ে ফেলতে। বুঝতে পারেননি, ওই বিষই অচিরে ধর্মের নামে বিচ্ছিন্নতাবাদকে ছড়িয়ে দেবে গোটা পঞ্জাবে এবং সমগ্র শিখ জাতির মুখাগ্র হয়ে উঠবে— ভিন্দ্রানওয়ালের সেই বুকে কাঁপন লাগানো স্লোগান— 'রাজ করে গা খালসা। খালিস্তান হমারে হক হ্যায়।' অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরকে 'দুর্গ'-এ পরিণত করে ওই ছিপছিপে চেহারার লম্বা ঢিলেটালা জোব্বা পরিহিত দৃশ্যত শান্ত তুখোড় সাহসী এবং বদমেজাজি যুবক সন্ত ভিন্দ্রানওয়ালে গোটা শিখ জাতির মধ্যে ম্যাজিকের মতো ছড়িয়ে ছিলেন বীজমন্ত্র— চাই স্বাধীন খালিস্তান। স্বাধীনতার সময়ে পঞ্জাব একবার ভাগ করেছিল ইংরেজ, সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃত্ব। এবার ফের আশঙ্কা দেখা দিল— পঞ্জাবের দ্বিতীয়বার বিভাজনের দাবি ঘিরে। এবং ওই দাবি কোনো গণতান্ত্রিক পথে নয়। সশস্ত্র হামলার পথে। মানুষ খুনের রাজনীতি দিয়ে।

ধর্মকে এমন নৃশংসভাবে নগ্ন করেননি এর আগে ভারতবর্ষের কোনও ধর্মীয় নেতা। ইন্দিরা গান্ধী শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েছিলেন নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে— নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বর্ণমন্দিরকে সেনাবাহিনীর সাহায্যে জঙ্গি মুক্ত করতে। অকাল তখত ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল সেনা ট্যাঙ্কের আক্রমণে। বুলেট বিঁধেছিল স্বর্ণমন্দিরে সোনার দেওয়ালে, অমূল্য ধর্মীয় পাঠাগার পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। শ'য়ে শ'য়ে ভারতীয় সেনার মৃত্যু হয়েছিল। মৃত্যু হয়েছিল ভিন্দ্রানওয়ালে-সহ তাঁর সমস্ত সশস্ত্র জঙ্গিবাহিনীর।

খালিস্তানের দাবির নটেগাছটি মুড়িয়ে দিয়েছিলেন ইন্দিরা। কিন্তু গল্প ফুরোয়নি। বিদ্রোহী শিখদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে। ১৯৮৪-র জুন মাসে স্বর্ণমন্দিরকে জঙ্গিমুক্ত করার ৩০ বছর পরে সেনা আক্রমণের অধিনায়ক কে এস ব্রারের গলায় ছুরি চালিয়েছিল খালিস্তানপন্থীরা লন্ডন শহরের রাজপথে। প্রাণে মারার চেষ্টা হয়েছিল পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা তনয় রাজীব গান্ধীকে। সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে ঠিকই। কিন্তু পঞ্জাব তার পরেও কি উগ্রপন্থামুক্ত হতে পেরেছে?

অতি সম্প্রতি, দিল্লির বিভিন্ন সীমান্তে নয়া কৃষি আইনের বিরোধিতায় রাস্তায় অবস্থানরত 'কৃষক'দের আন্দোলন পঞ্জাবের খালিস্তানপন্থীদের সেই অগ্নিস্নাত আন্দোলনের কথাই মনে করিয়ে দেয়। যে দিনগুলির সাক্ষী আমি নিজে আমি ছিলাম পঞ্জাবের মাটিতে একজন সাংবাদিকের ভূমিকায়। একদিন নয়, দুদিন নয়, মাসের পর মাস। বছরের পর বছর। কতবার ফিরতে হয়েছে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। কতদিন শুনতে হয়েছে ভিন্দ্রানওয়ালে এবং তাঁর অনুগামী ধর্মীয় তথা সংকীর্ণ রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদীদের কণ্ঠে সেই ভয়ংকর হাড় হিম করা ধ্বনি— খালিস্তান জিন্দাবাদ। শুনেছি, একদা পঞ্জাবের রাজ্যপাল সিদ্ধার্থশংকর রায়ের মুখে হতাশার সুর— 'এ আন্দোলনকে

নিয়ন্ত্রণ করা সহজ নয়। কারণ পঞ্জাবে সর্দারজী মাত্রেই খালিস্তানি। খালিস্তানের স্বপ্ন এদের রক্তে, মজ্জায়।' সেই স্বপ্নই যেন দুঃস্বপ্ন হয়ে ফিরে এল গত ২৬ জানুয়ারি। ভারতবর্ষের ৭২তম সাধারণতন্ত্র দিবসে দিল্লির রাজপথে। কৃষক আন্দোলনের নামে সারাদিন ধরে যে নারকীয় তাণ্ডবের ছবি টেলিভিশন চ্যানেলগুলির পর্দায় ভেসে উঠল, প্রত্যক্ষ করল গোটা ভারতবর্ষ, ভারতবাসীর তাতে কোথাও বুঝি তিলেকমাত্র সন্দেহও থাকার কথা নয়— কৃষকের ছদ্মবেশে ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের গলা টিপে মারতে সেদিন উদ্যত সর্দারজীরা ছিলেন খালিস্তানি— নিদেনপক্ষে খালিস্তানের সমর্থক তো বটেই। না, তাদের কণ্ঠে ছিল না 'খালিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি। না তাদের হাতে খালিস্তান লেখা কোনো পতাকাও ছিল না। কিন্তু যেভাবে সম্মিলিত মদতে এক যুবক লালকেল্লার শীর্ষে উড্ডীয়মান স্বাধীন ভারতের তেরঙা পতাকাকে অবজ্ঞা করে তারই নীচে একটি দণ্ডে ঝুলিয়ে দিলেন শিখদের ধর্মীয় নিশান, তাতে স্পষ্টতই অনুমান করতে অসুবিধা হয়নি— খালিস্তানের পিছনে যেমন প্রত্যক্ষ মদত ছিল পাকিস্তানের, এবারের কৃষক আন্দোলনের পিছনেও মদত ছিল প্রতিবেশী একাধিক দেশের। কারণ একটাই, দীর্ঘ ৬৭ বছরের জরদগব প্রশাসনের সংকীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বদলে মুক্ত চিন্তাধারার নয়া গণতন্ত্রে আঘাত হানা, যাতে ভারতবর্ষের মেরুদণ্ড সোজা না থাকে। যাতে কৃষকরাও গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। কারণ সাম্প্রতিক কৃষক আন্দোলন কোনোমতেই কৃষকদের আন্দোলন নয়। ফড়ে তথা এজেন্ট তথা দালালদের আন্দোলন যাদের স্বার্থে ঘা লেগেছে কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া কৃষি আইনে। যেটির পোশাকি নাম— ১. কৃষিপণ্য ব্যবসা-বাণিজ্য (উৎসাহ ও প্রতিশ্রুতি) আইন, ২. কৃষক (ক্ষমতায়ন ও রক্ষা) মূল্য নিশ্চিতকরণ এবং কৃষি পরিষেবা আইন, ৩. অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (সংশোধনী) আইন। সংকীর্ণ রাজনৈতিক বিরোধিতার মানসিকতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে যদি সুস্থ মনে আইনগুলির বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে স্পষ্টতই প্রতীয়মান যে নতুন এই কৃষি আইন এমন এক ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটাতে চাইছে যেখানে কৃষক ও ব্যবসায়ী কৃষিপণ্যের ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে। কখনই ফড়েদের মুখাপেক্ষী হয়ে কৃষকদের দীর্ঘ পরিশ্রমের ফসলকে ধরে রাখতে হবে না। শুধুমাত্র সবজি মান্ডি নির্ভর পণ্য বিক্রয়ের বদলে থাকছে বিকল্প ব্যবস্থাও যেখানে চাষি তাঁর পছন্দমতো ক্রেতাকে বেছে নিতে পারবে। যথাযথ দাম পাবার স্বাধীনতা থাকবে। নতুন বিপণন ব্যবস্থায় সে নতুন পথ ও প্রতিযোগিতার রাস্তা খুঁজে পাবে। শুধুমাত্র স্থানীয় বাজারের ওপর নির্ভর করতে হবে না। আন্তঃরাজ্য এবং আন্তর্জাতিক বাজারে ফসল পৌঁছে দেবার পথও সুগম হবে। সম্ভব হবে ডিজিটাল ভেজিটেবল মার্কেটিং। 'এক দেশ এক হাট' নীতির লক্ষ্যে গড়ে উঠবে একটি সুসংহত ও অভিন্ন বাজার। যেখানে কৃষক ও ভোক্তার মধ্যে ভাগ বসাতে পারবে না কোনো মধ্যস্বত্বভোগী।

সাম্প্রতিক কৃষক আন্দোলনে যারা এয়ারকন্ডিশান্ড টেন্টে আরামদায়ক সোফায় বসে 'রণক্লান্ত' পদযুগলের সেবার অটোম্যাটিক ভাইব্রেটর লাগিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, যারা টন টন গব্যঘৃতের আকাশ মাতাল করা সুগন্ধী হালওয়া', দামি বাসমতী চাউলের ভাত আর ক্ষেত থেকে সদ্য আমদানিকৃত তরকারি, কিংবা দ্বাদশ মশালায় পুষ্ট ধাব্বা ডাল, অথবা পঞ্জাব গমের পেষাই ময়দায় তৈরি এগ চিকেন রোল এবং নানা আমিষ পদে পঞ্চব্যঞ্জন সহযোগে লাঞ্চ করছিলেন, ব্রেকফাস্ট করছিলেন তাজা গরম ভৈষাঁ দুধ অথবা কমলালেবুর রস দিয়ে— তারা কেউই প্রান্তিক, ভূমিহীন কিংবা সাধারণ কৃষক নন। এমনকী জমিদার কৃষক সম্প্রদায়ের বৃহদংশও এই আন্দোলনের শরিক নন। কারণ তাঁরা বুঝেছেন, নয়া কৃষি আইন তাঁদের স্বাধীনতার সনদ। পরাধীনতার শৃঙ্খল নয়। কারণ নয়া কৃষি আইন কৃষকের বন্ধু, পরিবেশের বন্ধু। কৃষককে জমি অভিমুখী করে তোলার প্রয়াসী।

ঠিক তেমনিভাবেই কৃষি সুরক্ষা আইন হলো কৃষি চুক্তি সংক্রান্ত একটি জাতীয় আইনি ফ্রেমওয়ার্ক যার লক্ষ্য কৃষিকে শিল্পের স্তরে উন্নীত করা। কৃষক শুধু আর কৃষক হয়েই থাকবেন না। তিনি হবেন ব্যবসায়ীও। কোনো কারণেই কোনো সময়েই জমি তাঁর হাতছাড়া হবে না, জমি বন্ধক রাখতে হবে না মহাজনের কাছে। চাষের প্রাথমিক পর্বেই তিনি নিশ্চিত হতে পারবেন, লাভের কড়ি ঘরে তুলতে পারবেন কতটা।

এই আইন যাদের কোমরে আঘাত করেছে, তারা রটাচ্ছে যে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (সংশোধনী) আইন দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য যেমন আলু, পিঁয়াজ, ডাল, তৈলবীজ ইত্যাদির সরবরাহ আর রাজ্যের হাতে থাকবে না। আইন যাঁরা বোঝেন, এমনকী পঞ্জাবের কৃষিজীবী মানুষজনও বুঝেছেন, আইনে বলা হয়েছে, শুধুমাত্র জরুরি পরিস্থিতিতেই কেন্দ্র ওইসব সামগ্রীর সরবরাহের ওপর নিয়ন্ত্রণ জারি করবে। অন্য সময় নয়।

পাঠক লক্ষ্য করবেন, সাম্প্রতিক অতীতে পশ্চিমবঙ্গে আলু, পিঁয়াজ, লঙ্কার দাম বৃদ্ধির জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই আইনটিকে দায়ী করেছিলেন এবং মানুষের মনে ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দিয়েছেন নিজের সরকারের ব্যর্থতা ঢাকতে। ব্যর্থতাটা হলো, তাঁর সরকারের টাস্ক ফোর্সকে অকেজো করে বসিয়ে রাখা হয়েছে। মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছ থেকে সরকার শাসক দলের দুর্বৃত্ত বাহিনীর মাধ্যমে কাটমানি আদায় করেছে। যার জন্যই অসময়ে দাম বেড়েছে আলু ও পিঁয়াজের। সরকার চষির কাছ থেকে আলু কিনেছে যৎসামান্য। ফলে চাষি ফড়েদের ফাঁদে বলি হয়েছেন। নতুন কৃষি আইন এইসব চক্রান্ত থেকে কৃষকদের কাছে রক্ষাকবচ হয়ে উঠবে।

সামগ্রিকভাবে দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অর্থনীতিবিদরাও স্বীকার করেছেন, নতুন কৃষি আইনে যেমন আয়ের রাস্তা বাড়বে তেমনি সুগম হবে দেশের শস্যাগার নির্মাণ ও চাষ সংরক্ষণ প্রক্রিয়াও। রোধ হবে ফসলের অপচয়। কৃষি আইনের এইসব ইতিবাচক দিকগুলিকে ধামাচাপা দিয়েই ট্রাক্টরে ডি জে মিউজিক বাজিয়ে লাল-নীল-সবুজ আলোর বন্যা বইয়ে, ভাঙরা নাচে কোমর দুলিয়ে কৃষকের পেটের ভাত মারার অপচেষ্টা যারা করছে, তারা আর যাই হোক কৃষকের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নয় তো বটেই, তারা দেশেরও শত্রু। কৃষক আন্দোলনে কখনও তরোয়াল, বন্দুক নিয়ে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে স্লোগান তোলে না। কৃষক কখনও লক্ষ লক্ষ লিটার ডিজেল পুড়িয়ে পঞ্জাব থেকে দিল্লির পথে ব্যারিকেড ভাঙতে আসে না। কৃষক কখনও পুলিশের রক্তে স্নান করার অভিলাষ রাখে না। এসব সম্ভব একমাত্র সেইসব সন্ত্রাসবাদী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির পুজারিদের দ্বারাই যারা একসময় পঞ্জাবকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে চেয়েছিল। কারণ সেই সব দেশদ্রোহীরাই আজ মধ্যস্বত্বভোগীদের কোটি কোটি টাকা ব্যবহার করে কৃষকদের নিয়ে আন্দোলনের প্রহসনের খেলায় মেতে উঠেছে।

পঞ্জাবের কৃষকদের সামনে এখন নয়া কৃষিবিলকে আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে। বোঝাতে হবে, একদিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি, অন্যদিকে বিভেদকামী বাম রাজনীতি কৃষকদের

কৃষক আন্দোলন নিয়ে বিদেশের কেউ কেউ উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছেন, ভারতের মর্যাদাহানিকর টুইট করেছেন। ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট মানুষরা ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশিদের নাক গলানোর তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। এখানে তারই কিছু অংশ—

ভারতের সার্বভৌমত্ব নিয়ে সমঝোতা করা যায় না। ভারতীয়রা জানে তাদের কী করা উচিত। বাইরের লোক দেখতে পারে কিন্তু মন্তব্য করতে পারে না।

—শচীন তেণ্ডুলকর, প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং দেশের অধিনায়ক

অনেকদিন ধরেই নানা বিদেশি শক্তি ভারতকে কবজা করার জন্য আমাদের ঐক্য ফাটল ধরাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ভারত যা ছিল তাই থাকবে। ওরা যতই চেষ্টা করুক লাভ হবে না।

—গৌতম গম্ভীর, প্রাক্তন ক্রিটার

মতবিরোধ থাকলেও আমাদের এখন এক হয়ে থাকতে হবে। কৃষকেরা এ দেশের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমি নিশ্চিত, যুক্তিসংগত একটা সমাধান নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

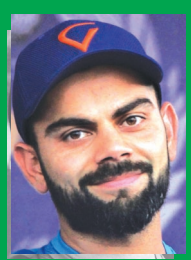

—বিরাট কোহলী, ভারতীয় ক্রিকেট দলেরঅধিনায়ক

কৃষি আমাদের অর্থনীতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কৃষকেরা আমাদের সমাজের মেরুদণ্ড। কৃষকদের সমস্যা আমাদের দেশেরই সমস্যা। আমরাই তার সমাধান করব।

—রবি শাস্ত্রী, ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রশিক্ষক

একজন ভারতীয় হিসেবে আমি বিশ্বাস করি, দেশের মানুষের যে কোনও সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতা ভারতের আছে।

—লতা মঙ্গেশকর, সংগীতশিল্পী

কৃষকেরা আমাদের দেশের খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাদের সমস্যার সমাধানে দেশ যে চেষ্টা করছে তার প্রমাণও আমরা পাচ্ছি। দেশের ঐক্য নষ্ট করার পরিবর্তে আমাদের উচিত গঠনমূলক কিছু ভাবা।

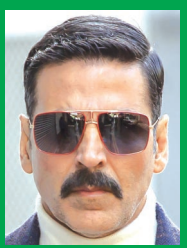

—অক্ষয়কুমার, হিন্দি ছবির অভিনেতা

ভারতের নীতির বিরুদ্ধে কোনওরকম মিথ্যে প্রচারে কান দেবেন না। আমাদের এখন নিজেদের মধ্যে লড়াই না করে এক হয়ে থাকতে হবে।

—অজয় দেবগণ, হিন্দি ছবির অভিনেতা

অধিকার সম্মান ও আর্থিক সুবিধা লাভে বঞ্চিত করতে চাইছে। তাঁদের বোঝাতে হবে, এটা কোনও আন্দোলন নয়। আন্দোলনের নামে দেশ ভাঙার চক্রান্ত। কেন্দ্রে বিজেপি সরকার ভারতবর্ষের নয়া রূপকার নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে যখন দেশের কৃষকদের হাতে তুলে দিতে চাইছেন এক নতুন ভারতবর্ষকে, তখন দেশের শত্রুরা রাজনৈতিক দলের প্রতিভূ হয়ে কৃষকদের জন্য চোখে জল ফেলছে। এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কিছু হতে পারে না। ভালোভাবে মেলালেই বোঝা যাবে— কৃষকের নামে এই আন্দোলন '৭০-এর দশকের মাওবাদী আন্দোলন, দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসা শাহিনবাগ আন্দোলন, পশ্চিমবঙ্গে কিষেনজীর মাওবাদী আন্দোলন এবং অবশ্যই পঞ্জাবের খালিস্তান আন্দোলন থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়।

তাই এখন প্রতিটি দেশবাসীর কর্তব্য, বিশেষ করে শিক্ষিত এবং মুক্তমনা মানুষের— প্রকৃত সত্যটাকে সমগ্র দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা। চক্রান্তকারীদের বুঝিয়ে দেওয়া— এ মাটি আমার মাটি, এ মাটি তোমারও মাটি। এ মাটি আমাদের দেশের মাটি। দুর্বৃত্তরা এ মাটিকে ঘাঁটি গড়তে পারবে না।

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক)

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে পালাবদলের জন্য

কল্যাণ চক্রবর্তী

কোনো বাঁধই আর ঠেকানো যাচ্ছে না। যে দলের পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসা কেবল সময়ের অপেক্ষা, সেই দল সম্পর্কে সামান্য জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশনের জন্যই প্রস্তুত প্রতিবেদন। সারা বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দলের শিরোপা যে দলের মাথায়, সেই দল অর্থাৎ ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি বা ভাজপা দলের জন্ম বিগত ১৯৮০ সালের ৬ এপ্রিল। ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল 'জনসঙ্ঘ', যার নেতৃত্বে ছিলেন ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, তারই উত্তরাধিকার পেয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। 'জরুরি অবস্থা' নামক গণতান্ত্রিক অমাবস্যার কালোদিনে স্বৈরাচারী ইন্দিরা গান্ধীকে পরাস্ত করতে, সমবেত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ১৯৭৭ সালে জনসঙ্ঘের বিলোপ সাধন হয়। তৈরি হয় জনতা দল, তাতে নানান দলের সংযুক্তি। সে এক ঐতিহাসিক ঘটনাবহুল দিনপঞ্জি বটে। ভোটযুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস পরাজিত হলো কিন্তু সময় যেতে না যেতেই পূর্বতন জনসঙ্ঘের বিরুদ্ধে শুরু হয়ে গেল চক্রান্ত। মাথা নোয়ালেন না রাষ্ট্রপ্রেমিক অটলবিহারী বাজপেয়ী। ক্ষমতা ছেড়ে বেরিয়ে এলেন জনসঙ্ঘের কার্যকর্তারা। পদ্মফুল ফুটলো নতুন করে, তৈরি হলো নতুন দল, সৌকর্যে প্রকাশিত হলো 'ভারতীয় জনতা পার্টি'। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস এক নতুন ও ঐশীখাতে বইতে শুরু করলো।

বিজেপি দল মাত্র দুটি আসনে জয়লাভ করে ১৯৮৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর পথ চলা শুরু করল। অন্য দলের সদস্যরা সংসদে হাসাহাসি করতো। সংসদে দাঁড়িয়ে বাজপেয়ীজী তাদের উদ্দেশে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন, আজ আপনারা যে দলের সংখ্যা নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করছেন, একদিন সংখ্যার অমোঘ সত্যে তারই বিপ্রতীপ আপনাদের লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। বাজপেয়ীজীর বাণী ঋত-সত্য হয়েছে। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে সেই দলটিই একক ভাবে পেয়েছে ৩০৩টি আসন। তারাই এখন ভারতবর্ষ পরিচালনা করছে। এবার দেখে নেবো এই দল কী অসীম শক্তিতে এগিয়েছে। এগিয়েছে আপন লক্ষ্যে। জাতীয়তা, রাষ্ট্রীয় একতা, গণতন্ত্র ও বিকেন্দ্রিত অর্থনীতিতে দলের দায়বদ্ধতা বজায় রেখে। মিথ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা নয়, প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার বতাবরণ ও মূল্যবোধের রাজনীতিকে দলের আদর্শ করে। রাজনৈতিক আঙিনায় দেশের স্বার্থকে সর্বোচ্চ স্থানে রেখেছে এই দল। রাষ্ট্রের সুরক্ষায় কোনো আপোশ চলে না, তা বারে বারে প্রমাণ করেছে তারা। ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতিকে ছুঁড়ে ফেলার কৃতিত্বও এই দলের। কারণ এই দল প্রতিষ্ঠিত একাত্ম মানব দর্শনের উজ্জ্বল উদ্ধারে। প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যময় জীবনচর্যা ও মানসচর্চা দলের ভিতকে শক্তি দিয়েছে। সমষ্টির মধ্যে ব্যক্তির সার্বিক বিকাশই দলের মূলসুর। ধর্ম যা কর্তব্যের এক অপরূপ প্রকাশ; ধর্ম যা পশুত্বকে ছাপিয়ে মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ করে; এবং তারও ঊর্ধ্বে অন্তর্নিহিত দেবত্বকে প্রকাশ করার আয়োজন রয়েছে, তারই অনবদ্য ভূমিকায় ব্যষ্টি ও সমষ্টির বিকাশ সম্ভব— বিশ্বাস করে এই দল।

১৯৮৯ সালের নির্বাচনে বিজেপি ৮৯টি আসন লাভ করেছিল। ১৯৯১ সালে এই দল পেল ১২০টি আসন। ১৯৯৬ সালে এই দলের হাতে ছিল ১৬১ জন সাংসদের শক্তি। বিজেপির ক্রমাগত শক্তিতে ভয় পেয়ে অন্য রাজনৈতিক দলগুলি যথাসাধ্য আটকাতে শুরু করলেও শেষ রক্ষা হলো না। ১৯৯৬ সালের ১৩ দিনের সরকার, ১৯৯৮ সালে ১৩ মাসের সরকারের পর ১৯৯৯ সালে এল পূর্ণ সময়ের বিজেপির মন্ত্রীসভা। ২০১৪ সালের নির্বাচনে ২৮২টি আসন পেল এই দল, একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দেশের নেতৃত্বে এলেন নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। ২০১৯-এর নির্বাচনেও বিজেপির প্রত্যাশিত ও ব্যাপক জয় দেখেছে বিশ্ব। দেশের অধিকাংশ রাজ্য আজ বিজেপি শাসিত।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ২০১৬ সাল থেকেই প্রধান প্রতিপক্ষ, মানুষ উপলব্ধি করেছে। বাম শাসনে এবং পরবর্তী শাসনের শত চেষ্টাতেও এ দলকে রোখা যায়নি। ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির বহু নেতাকর্মীকে হত্যা করা হয় নির্মমভাবে। মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মারধোর করা হয়। মানুষ তার যোগ্য জবাব দেবার জন্য তৈরি হলো। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে এই দলকে ১৮টি আসন উপহার দিয়ে মানুষ বুঝিয়ে দিল, রাজনীতিতে এই নোংরামি তারা মেনে নেবে না।

বিশ্বের গণতন্ত্রের ইতিহাসে এই দল আজ এক অনন্য নাম, অনন্য তার অগ্রগতি। কোনো দলের আজ ক্ষমতা নেই এই দলকে পশ্চিমবঙ্গে আটকায়। প্রাক্তন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী এই দলের সম্পদ ছিলেন, মানুষ ভুলে যায়নি। এই দলেই নানান গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যাপৃত ছিলেন লালকৃষ্ণ আদবানী, ড. মুরলী মনোহর যোশী, কুশাভাউ ঠাকরে, সুন্দর সিংহ ভাণ্ডারী, মানুষ তাও মনে রেখেছে। এক রাষ্ট্রনেতা যেভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, সমগ্র ভারতবাসীর সঙ্গে রাজ্যবাসীও পর্যবেক্ষণ করেছে। 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস' এই দলের নির্ভেজাল স্লোগান, তা বিশ্বাস করেছে সংখ্যালঘু মানুষ। উন্নয়নই মূল চালিকাশক্তি এই দলের। ভোটব্যাঙ্ক বানিয়ে রাখার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে ভারতীয় জনতা পার্টির জয়রথ এগিয়ে আসছে। আসছে, আসছে, আসছে...। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অধীর আগ্রহে শঙ্খধ্বনি দিয়ে এই দলকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। □

দেশ না থাকলে নিশ্চিন্তে সাধনভজনও সম্ভব নয়

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'মুসলমানগণ যখন এই দেশে প্রথম প্রবেশ করে তখন তাঁহাদের ঐতিহাসিক মতে এই ভারতবর্ষে ৬০ কোটি হিন্দুর অধিবসতি ছিল। এই গণনায় অত্যুক্তিদোষ না থাকিয়া বরং অনুক্তি দোষ আছে, কারণ মুসলমানদিগের অত্যাচারেই অনেক হিন্দু ক্ষয় হইয়া যায়। অতএব স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, হিন্দুর সংখ্যা ৬০ কোটিরও অধিক ছিল; কিছুতেই ন্যূনতম নয়। কিন্তু আজ সে হিন্দু ২০ কোটিতে পরিণত হইয়াছে। তাহার উপর খ্রিস্টানরাজ্যের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ২ কোটি লোক খ্রিস্টান হইয়া গিয়াছে এবং প্রতি বৎসর প্রায় লক্ষাধিক লোক খ্রিস্টান হইয়া যাইতেছে'। আমাদের দেশে ব্রহ্মজ্ঞানী, ঐশ্বরিক শক্তি, দুরদৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষ অনেক ছিলেন হয়তো-বা এখনও আছেন। শুনেছি কলকাতায় আশ্রমে বসে জপ করতে করতে এক সাধুবাবা হঠাৎ হেই হেই করে উঠলেন। শিষ্যরা সব ছুটে এল, কী হয়েছে বাবা, কী হয়েছে বাবা করতে করতে। সাধুবাবা বললেন ও কিছু না, বিপদ কেটে গ্যাছে। বৃন্দাবনে আশ্রমের ছাগলটা তুলসীগাছটা খেয়ে নিচ্ছিল, আমি হাততালি দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছি।

আমার প্রশ্ন, শক, হূন, পাঠান, মোগল বিদেশি অক্রমণকারীরা যখন ভারত আক্রমণ করতে আসছিল তখন আমাদের ঐশ্বরিক শক্তি-সহ দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সাধাবাবারা খাইবার পাশ বা ওইসব অঞ্চলেই আক্রমণকারীদের আটকে দিতে পারতেন। তা কিন্তু হয়নি। আক্রমণকারীরা সারা ভারত দখল করে হাজার বছর রাজত্ব করে গেল। আর একজন ছিলেন গৃহী সন্ন্যাসী। তিনি একবার তাঁর ইংরেজ বড়োসাহেবকে বিমর্ষ দেখে প্রশ্ন করে জেনেছিলেন ইংল্যান্ডে তার স্ত্রী খুবই অসুস্থ। ডাক্তাররা তাকে সুস্থ করতে পারছেন না। ওই গৃহী সন্ন্যাসী সেই রাত্রেই সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে ইংল্যান্ডে চলে গিয়ে ওই মেমসাহেবকে সুস্থ করে ফিরে আসেন। আমার প্রশ্ন, আমাদের দেশে হাজার হাজার অসুস্থ বা রোগী রয়েছেন তাদের কতজনকে ওই গৃহী সন্ন্যাসী সুস্থ করে তুলেছেন? আর একজন বাবা নাকি একবার মক্কা গিয়েছিলেন। কেন গিয়েছিলেন বলতে পারব না। আমি তাঁর শিষ্যদের বলেছিলাম কোনও অমুসলমানকে মক্কার ধারে কাছে কাউকে দেখলে তাকে মেরে ফেলা হয়। তখন জবাব পেয়েছিলাম উনি সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে মক্কা গিয়েছিলেন।

উত্তর ভারতে মুসলমানরা যখন অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা চালাচ্ছিল তখন দাক্ষিণাত্যে শঙ্করাচার্য পরম নিশ্চিন্তে প্রচার করছিলেন 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'। উত্তর ভারতের তাণ্ডবলীলা নিয়ে তাঁর কোনও বিকার ছিল না। সুলতান মামুদ যখন মথুরা বৃন্দাবন তছনছ করছিল, মামুদের সেনারা হিন্দু নারীদের সম্ভ্রম নিয়ে ছিনিমিনি খেলছিল তখন কিন্তু কৃষ্ণভক্তরা অস্ত্র ধরেননি। কিন্তু এখনও আমরা আউরে চলেছি 'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে...' ইত্যাদি। আমার বক্তব্য, অস্ত্রধারণ না করে শুধু মন্ত্রোচ্চারণ, গীতাপাঠ, হরিসংকীর্তন, যাগযজ্ঞ করে দেশ রক্ষা করা যায় না, শত্রু বিনাশ হয় না। আমরা হিন্দুরা কি এটা কোনও দিনও অনুধাবন করতে পারব না? চিরকাল বিধর্মীদের অত্যাচার সহ্য করব? ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী সাধু-সন্ন্যাসীদের তাহলে দেশের প্রয়োজনটা কী?

দেশভাগের সম্ভাবনা দেখা দিতেই এক ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষ তাঁর পাবনার আশ্রম, শিষ্য-শিষ্যা, ভক্তবৃন্দ ছেড়ে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিলেন হিন্দু প্রধান ভারতের বিহারে। নতুন করে আশ্রম ও সংগঠন তৈরি হলো, প্রচার শুরু হলো। আর এক বাবা ব্রহ্মচারী ঢাকা জেলার মেদিনী মণ্ডল গ্রামে পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর আশ্রম ছেড়ে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিলেন পশ্চিমবঙ্গে। আশ্রম তৈরি হলো সুখচরে। আবার শুরু করলেন পূজাআর্চা যাগযজ্ঞ ইত্যাদি। দেশভাগ হতেই মা আনন্দময়ী ঢাকায় তাঁর আশ্রম ছেড়ে পালিয়ে এলেন ভারতে। হরিদ্বারের কাছে কনখলে তাঁর আশ্রম তৈরি হলো। আবার শুরু হলো নতুন করে যাগযজ্ঞ, পূজাআর্চা, তীর্থযাত্রা ইত্যাদি। তাই আমার প্রশ্ন, এইসব সাধুবাবাদের ওপর বেশি নির্ভরশীল না থেকে আমাদের উচিত হবে আত্মনির্ভরশীল হওয়া, শক্তিশালী হওয়া, বিধর্মীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধভাবে তা প্রতিরোধ করা, প্রয়োজনে প্রতিশোধ নেওয়া।

—শুভব্রত ব্যানার্জি,
বড়বাজার, চন্দননগর, হুগলী।

লালকেল্লায় উগ্রপন্থী

সাধারণতন্ত্র দিবসে লালকেল্লায় খালিস্তানি উগ্রপন্থীদের পতাকা সারাদেশ দেখেছে। সেদিন জাতীয় পতাকা সরিয়ে খালিস্তানি উগ্রপন্থী সংগঠন 'শিখ ফর জাস্টিসের' পতাকা লাগানো হয়। প্রশ্ন হলো, কৃষক আন্দোলনে খালিস্তানিদের অনুপ্রবেশ ঘটল কী করে? যদিও কৃষক আন্দোলনের নেতারা দাবি করেছিলেন যে পতাকা লাগানো হয়েছে সেটি খালিস্তানি পতাকা নয়। কারণ পতাকার রং নাকি গৈরিক, যা আদতে নিশান সাহিবের রং। তাদের আরও দাবি, পতাকায় নাকি 'নিশান সাহিব' কথাটি লেখাও রয়েছে। অথচ সারা দেশ দেখেছে পতাকার রং গৈরিক নয়, হলুদ। খালিস্তানিদের পতাকার হলুদ রং সারা বিশ্ব জানে। সম্প্রতি নিউইয়র্কের রাস্তায় হলুদ রঙের পতাকা-শোভিত খালিস্তানি উগ্রপন্থীদের গাড়ির মিছিল দেখা গেছে। কৃষক আন্দোলনের নেতারা যতই দেশকে বোকা বানানোর চেষ্টা করুন ফেসবুক-টুইটারের যুগে সেটা সম্ভব নয়।

—দেবাশিস রক্ষিত,
কলকাতা-৬।

শ্রীরাম নামের তাৎপর্য

মহাকাব্য রামায়ণের শ্রীরামের কথা বলছি। রাম নামের তাৎপর্য নিয়ে অনেকেই হয়তো নানা কথা বলেছেন। একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে আমিও কিছু বলতে চাই।

'রমণ' শব্দের বিভিন্ন অর্থ হলেও অন্যতম অর্থ হচ্ছে ঘোরাফেরা করা। আবার হিন্দিতে একটা কথা আছে 'রমতা যোগী' যার অর্থ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা যাওয়া বোঝায়।

আমরা জানি, রামায়ণে রাম-লক্ষ্মণ কৈশোর অবস্থায় ঋষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাক্ষসদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে ঋষির আশ্রমে যান। তাড়কা ও অন্য রাক্ষসদের বধ করে এবং অহল্যাকে উদ্ধার করে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে জনকপুরে পৌঁছান। অযোধ্যা থেকে জনকপুরের দূরত্ব প্রায় পাঁচশো কিলোমিটার ধরা যায়। সম্পূর্ণ পথ হেঁটেই পার করেন। কোনোরকম বাহন ব্যবহার করেননি। আবার বনবাস যাত্রায় তপস্বী বেশে উত্তর ভারতের অযোধ্যা থেকে সুদূর দক্ষিণ ভারত পার করে লঙ্কায় পৌঁছান। এই পথের দূরত্ব কমপক্ষে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটার ধরা যায়। লক্ষণীয়, দীর্ঘ ১৪ বছরের বনবাস যাত্রা ছিল পায়ে পায়ে।

স্মরণীয়, শ্রীকৃষ্ণকে মথুরা থেকে গোকুল-বৃন্দাবনে যেতে হয়। আবার বৃন্দাবন থেকে কুরুক্ষেত্রে যান। এর পরে সুদূর সমুদ্রতটে অবস্থিত দ্বারকায় রাজা হন। কৃষ্ণের যাত্রা কম ছিল না, তবে উনি বাহন ব্যবহার করেছেন। পৌরাণিক বা মহাকাব্যে কেউ রামের মতো পৃথিবীলোকে দীর্ঘ পদযাত্রা বা পদে রমণ করেননি। রমণের মাধ্যমে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন রাম। এরূপ অভূতপূর্ব বৈচিত্র্যময় রমণের মহানায়কের নাম 'রমণ' শব্দের অনুকরণে 'রম' বা 'রাম' হওয়াই সঙ্গত।

—রাজকুমার জাজোদিয়া,
কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

জগতের কল্যাণের জন্যই ভারতের বেঁচে থাকা প্রয়োজন

প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদেরকে 'ঋষি' বলা হতো। ভারতের ঋষিরা যখন পৃথিবীর প্রাচীনতম এই দর্শন আবিষ্কার করেন তখনও প্রচলিত আধুনিক মত-পন্থগুলির একটিও উৎপন্ন হয়নি। স্বামী বিবেকানন্দকে বিদেশে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'আপনার দেশের ঋষিরা কেন আমাদের দেশে এসে এই জ্ঞানের প্রচার করেননি?' স্বামীজী উত্তরে বললেন, 'কোথায় প্রচার করবেন? কাদের কাছে? তোমাদের কাছে এসব প্রচার করলে তোমরা বুঝতেই পারতে না। তোমরা তখন বনে জঙ্গলে আদিম জীবন যাপন করছো। সভ্যতার সেই ঊষালগ্নে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ যখন আদিমতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, তখন ভারতবর্ষে প্রজ্বলিত হয়েছিল এই সনাতন জীবনদর্শনের আলোকবর্তিকা। এই দর্শনই আমাদের জাতীয়তার ভিত্তি, আমাদের রাষ্ট্রীয় দর্শন। এই আদর্শ 'ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ'—এই চতুর্বর্গের সাধনায় পার্থিবতার সঙ্গে পারমার্থিকতার মেলবন্ধন ঘটিয়েছে। শুধু ভোগময় পার্থিবতা মানুষকে তৃপ্ত করে না। তাই ত্যাগময় ধর্মের পথেই এই আদর্শকে সামনে রেখে ভারতের সম্রাট অশোক গ্রহণ করেছিলেন ধর্মবিজয়ের নীতি।

এই আমাদের ভারত, যেখানে রাজা অক্লেশে রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করেন। যেখানে পার্থিব সম্পদের অহংকার পরাভূত হয় জ্ঞানের কাছে, যেখানে অরণ্যচারী ঋষির পদতলে লুটিয়ে পড়ে রাজমুকুট। আমাদের জাতীয় দর্শনের জনক এই প্রাচীন ঋষিরা আবিষ্কার করেছিলেন জগতের অখণ্ডতার তত্ত্ব, অর্থাৎ জাগতিক বিভিন্নতার অন্তরালে একত্বের তত্ত্ব, যাকে ব্রহ্ম নামে অভিহিত করা হয়। এই সুউচ্চ আধ্যাত্মিক একত্বমূলক মিলনভূমিতে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নেই, জাতিভেদ নেই, এমনকী পাপী-পুণ্যবানের ভেদও নেই। তাই সনাতন বৈদিক শিক্ষা হলো বসুধৈব কুটুম্বকম্। —সমগ্র বিশ্বই আমার আত্মীয়।

কিন্তু ভারতের এই ভ্রাতৃত্ববোধ, এই উদার 'বসুধৈব কুটুম্বকম' নীতি বার বার রক্তাক্ত হয়েছে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় : 'রক্তমাখা অস্ত্রহাতে যত রক্ত আঁখি' বারবার আঘাত হেনেছে আমাদের বুকে। ব্যর্থ হয়েছে বারবার 'শান্তির ললিত বাণী'।

আমাদের দেশের জন্যেই শুধু নয়, আমাদের এই রাষ্ট্রীয় আদর্শের পুনর্জাগরণ জগতের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন। মানব জাতির কল্যাণে সনাতন আধ্যাত্মিক আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখতে ভারতের বেঁচে থাকা প্রয়োজন। কারণ ভারতের মাটিই এই আদর্শের জননী। বুদ্ধ থেকে বিবেকানন্দ ভারতের এই আলোকবর্তিকা নিয়ে বিশ্ববাসীকে বারবার আলোকিত করেছেন।

এই সনাতন জীবন-দর্শন মিলেমিশে এক হয়ে গেছে ভারতের রাষ্ট্রীয় বোধের সঙ্গে। এই চেতনাই ভারতীয়ত্ব, এই চেতনাই আমাদের জাতিগত ও সংস্কৃতিগত মূল শিকড়। এরই নাম হিন্দুত্ব।

আমাদের রাষ্ট্রীয় চেতনা নিজের মুক্তি ও জগতের কল্যাণের কথা বলে। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।' —এই হলো ভারতের আর মর্মবাণী।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে ভারতের নবজাগরণের হাতিয়ার হিসাবে স্বামীজী বেদান্তকে গ্রহণ করেছিলেন। ঘোষণা করেছিলেন 'আমি নেড়েচেড়ে এদের মধ্যে সাড় আনতে চাই। বেদান্তের অমোঘ মন্ত্রবলে এদের জাগাবো। এজন্যে আমার প্রাণান্ত পণ।'

স্বামীজীর এই কর্মপদ্ধতি আমাদের রাষ্ট্রীয় চেতনার রূপরেখা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করছে।

—তাপস ঘোষ,
গান্ধীপল্লী বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা।

নারী ও পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, পরিপূরক

সন্দীপা বসু

আচ্ছা, পুরুষরা এ সমাজে কেমন আছে? কতটা সুরক্ষিত তারা? তাদের দিক থেকে কখনও তেমন কোনও প্রতিবাদ শুনতে পাওয়া যায় না কেন? পুরুষের নালিশ জানানোর জায়গা কোথায়? নাকি তাদের সঙ্গে কখনও কোনও অন্যায় হয় না? পুরুষ বলেই কি তার কোনও সমস্যা থাকতে নেই? পুরুষ বলেই কী তাদের সমস্ত প্রতিবাদ ওই হাসি-ঠাট্টা-মজার-চুটকিতেই আবদ্ধ হয়ে থেকে যায়? সমাজের সর্বস্তরে মেয়েদের অনেক অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে এগোতে হয়— এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েও প্রশ্ন জাগে, এর কি একটা উলটো দিক নেই? কর্মক্ষেত্রে বা বাড়িতে নানা প্রতিকূলতার কথা যদি ছেড়েই দেওয়া হয়, যদি শুধুমাত্র সব থেকে জ্বলন্ত বিষয়, যৌন নিগ্রহ বা যৌন হেনস্থার বিষয়টিকেই বেছে নেওয়া হয়, তাহলে প্রশ্ন ওঠে শুধু কি মেয়েরাই এর শিকার?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সাইকোথেরাপিস্ট এবং ম্যারেজ কাউন্সেলর জানাচ্ছেন, তার কাছে এরকম অসংখ্য কেস আসে যেখানে শুধুমাত্র অসুস্থ যৌনতার কারণে দাম্পত্য জীবনে সমস্যা তৈরি হয়েছে। সমস্যা এতটাই গভীর যে বিচ্ছেদের রাস্তায় হেঁটেছেন তারা। যেহেতু আজও আমাদের সমাজ বিয়ে ভেঙে যাওয়াটাকে একটু বাঁকা চোখেই দেখে থাকে, তাই উকিলের পরামর্শে, বিয়ে টিকিয়ে রাখার শেষ চেষ্টা করতে দৌড়ে এসেছেন কাউন্সেলরের চেম্বারে। সমস্যার মূলে যেতে গিয়ে অনেক সময়ই দেখা গেছে এদের মধ্যে অনেকেই শৈশবে বা কৈশোরের শুরুরদিকে কোনও না কোনও ভাবে তিক্ত যৌন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছেন। অনেক ক্ষেত্রেই একবার নয়, বারংবার। সেই ঘটনা তাদের মনে এমন ভাবে দাগ কেটে গেছে যে তারা সুস্থ বিবাহিত জীবন কাটাতে অক্ষম হয়ে পড়ছেন। এদের মধ্যে নারী ও পুরুষের অনুপাত কিন্তু প্রায় সমান। অর্থাৎ ঠিক যতজন নারী ছোটোবেলায় যৌন হেনস্থার শিকার হয়েছেন ঠিক ততজন পুরুষও একই ভাবে যৌন হেনস্থার শিকার হয়েছেন।

মনে পড়ে, পরিবারের বয়স্ক মহিলাদের বাড়ির শিশুপুত্রটিকে আদর করার ঘটনা। এমনই সহজে, প্রকাশ্যে করা হয় সে আদর যে কোনও অস্বাভাবিকতা চোখে পড়ে না সেভাবে। শিশুটি যখন হাঁটতে পারে, কথা বলে, স্কুলে যাওয়াও শুরু করেছে— সে আদর চলে তখনও। শিশুটি লজ্জা পায়, রেগে যায়, অভিমান করে, শিশুটি যদি শিশুকন্যা হয় তা হলে উলটোদিকে থাকে পরিবারের বয়স্ক পুরুষের দল। ঘটনা একই রইল। এবারে? লজ্জা, সম্ভ্রম, সম্মান, গোপনীয়তার অধিকার কি মেয়েদের একচেটিয়া? ভুলে গেলে চলবে না যে প্রকৃতি কিন্তু এই সহজাত অনুভূতিগুলির কোনও লিঙ্গভেদ করেননি। করেছি আমরা।

আরও আছে। কম বয়স্ক কাকি, মামি, পিসি, মাসি বা একটু বড়ো দিদি— এদের হাত ধরে কৈশোরের শুরুতেই জীবনের এক অন্য অধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে এমন পুরুষের সংখ্যা নেহাত কম নয়। আর শুধুমাত্র পুরুষ বলেই তারা ব্যাপারটা উপভোগ করেছেন এমন ভেবে নেওয়াটা নেহাতই অসুস্থতার লক্ষণ। ঠিক একটি কন্যা সন্তানের মতোই তারাও হয়তো ভয়ে, লজ্জায় ও আতঙ্কে কিছু বলে উঠতে পারেননি। উপরন্তু পুরুষের ওপর থাকে আরও একটি চাপ। পুরুষ হবার চাপ। তার সঙ্গেও যে অন্যায় হয়, সমাজ সে কথা স্বীকার করে না। সে নিজের কথা বললে তাকে হয় হাসির পাত্র হতে হয় অথবা তাকেই দোষী করা হয়। যদি বা কখনও মেনে নেওয়া হয় যে তার ওপর অন্যায় হয়েছে তাহলেও কারণ হিসেবে আর যাই উঠে আসুক বা যাকেই দায়ী করা হোক— কোনওভাবেই কোনও মহিলাকে দায়ী করা হবে না।

কর্ম জগৎ? সেখানেও কি শুধু নারীই যৌন হেনস্থার শিকার আর পুরুষ নিরাপদ? বাস্তব চিত্র কিন্তু অন্য কথা বলছে। নারীকে প্রকৃতি অনেক অস্ত্র দিয়েই গড়েছে। সেই অস্ত্র যেমন কখনও কখনও তার বিপদ ডেকে আনে কখনও সেই অস্ত্রই তার হাতিয়ার হয়ে ওঠে পুরুষকে কাবু করার এবং নিজের আখের গুছিয়ে নেবার। সময়ে সময়ে সে নিজেকে ব্যবহার করে নিজেরই স্বার্থ সিদ্ধির জন্য।

আজ যখন নারী অনেক শক্তিশালী, যখন ঘরে-বাইরে নিরবচ্ছিন্ন লড়াই করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, এই সময় দাঁড়িয়ে আমরা কি এমন এক সমাজ আশা করতে পারি না যেখানে, নারী ও পুরুষ একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, একে অন্যের পরিপূরক হয়ে পাশাপাশি পথ চলবে?

ক্ষমতা এক দু'মুখো তলোয়ার। যে ব্যবহার করতে জানে, জয় তারই হয়। অপব্যবহার পরাজয় ডেকে আনে— একথা ভুলে গেলে চলবে না। আজ সময় এসেছে নারীর নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার এবং তাকে সঠিক ভাবে ব্যবহার করার। ঘরে-বাইরে দৃষ্টান্ত স্থাপন করার। পুরুষ যে ভুল করেছে এতদিন, সে ভুলের যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, তা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব আজ অনেকটাই নারীর হাতে। শুধুমাত্র নারীর ওপর অন্যায়ের বিরুদ্ধে নয়, লিঙ্গভেদ ভুলে যেদিন নারী গর্জে উঠবে সবার ওপর সব রকম অন্যায়ের প্রতিবাদে, সেদিনই শুরু হবে এক সুন্দর পৃথিবীর। ◘

হাঁপানি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

হাঁপানি যে কোনও বয়সেই হতে পারে। তবে এটি সংক্রামক বা ছোঁয়াচে নয়। এই রোগে প্রদাহজনিত শ্বাসনালীর সংবেদনশীলতা বেড়ে যায়। ফলে ঘন ঘন কাশি, শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা, সাঁই সাঁই আওয়াজ, বুকে চাপ বা দম নিতে কষ্ট হওয়ার মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে। যদি সঠিক ভাবে উপযুক্ত চিকিৎসা না নেওয়া হয়, তাহলে এই রোগে অনেক সময় মৃত্যুও হতে পারে। হাঁপানির সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। এই রোগের জন্য কোনও কিছুকে এককভাবে দায়ী করা যায় না। গবেষণায় দেখা গেছে, কারো বংশগত কারণে বা পরিবেশগত কারণেও এই রোগ হতে পারে। কারো নিকটাত্মীয়ের যদি হাঁপানি থাকে বা কেউ যদি বিভিন্ন দ্রব্যের প্রতি অতিমাত্রায় অ্যালার্জিক হন, তাহলে তাঁর হাঁপানি হতে পারে। এছাড়া শ্বাসনালী যদি অতিমাত্রায় সংবেদনশীল হয়, তাহলেও এই রোগ হতে পারে।

এছাড়া ধুলোবালির মধ্যে থাকা মাইট নামের ক্ষুদ্র কীট থেকে, ফুলের রেণু থেকে, পশুপাখির পালক, ছত্রাক, মল্ট, ইস্ট থেকে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে যাঁরা থাকেন তাদের এই রোগ হতে পারে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ধূমপান শুধু শ্বাসকষ্টের কারণই নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই এটা হাঁপানির ওষুধের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়, কখনও কখনও ফুসফুসের দীর্ঘস্থায়ী কার্যক্ষমতাও কমে যায়।

কিছু উত্তেজক উপাদান অনেক সময় সংবেদনশীল রোগীর শ্বাসকষ্ট শুরু করতে পারে— যেমন শ্বাসনালীর সংক্রমণ অ্যালার্জি জাতীয় বস্তুর সংস্পর্শে, বায়ুদূষণ, সিগারেটের ধোঁয়ার কারণেও এটি হতে পারে। কোনও কোনও ওষুধ, যেমন— বিটাব্লকার, যা উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়, এনএসএআইলি (ব্যথা নিরাময়কারী ওষুধ), অ্যাসপিরিন কোনও কোনও ক্ষেত্রে হাঁপানির কারণ হতে পারে।

এছাড়া মানসিক চাপে থাকলে হাঁপানির তীব্রতা বেড়ে যেতে পারে। কোনও কোনও খাবারের মাধ্যমে যে অ্যালার্জি হয় তাতে খুব কম লোকের শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। কারও কারও বিভিন্ন সুগন্ধি, মশার কয়েল বা কারও কারও কীটনাশকের গন্ধ থেকেও শ্বাসকষ্ট বেড়ে যেতে পারে।

হাঁপানি নির্ণয়ের প্রথম ধাপ হচ্ছে রোগীর বিস্তারিত ইতিহাস জানা। হাঁপানির প্রধান উপসর্গগুলো হলো শ্বাসকষ্ট, কাশি, বুকের মধ্যে শোঁ শোঁ শব্দ হওয়া, বুকে চাপ অনুভব করা বা অল্পেই দম ফুরিয়ে যাওয়া। তবে কখনও কখনও দু'বার অ্যাটাকের মধ্যে রোগীর হাঁপানির কোনও উপসর্গ নাও থাকতে পারে। অল্প যে কোনও একটি বা এরও বেশি উপসর্গ থাকতে পারে।

সাধারণত এই উপসর্গগুলো রাতে বা খুব সকালে বেশি হয় এবং শ্বাসনালীতে কোনো ধরনের অ্যালার্জেন প্রবাহ প্রবেশ করলে বা অল্পমাত্রায় পরিবর্তিত হলে এই উপসর্গের তীব্রতা বেড়ে যায়। কারো কারো ক্ষেত্রে বা শ্বাসকষ্টের শুরুর আগে নাক চুলকায়, হাঁচি হয়, নাক দিয়ে জল পড়ে, চোখ লাল হয়ে যায়। ওপরের উপসর্গগুলো সঙ্গে বংশে কারো যদি হাঁপানিতে আক্রান্ত হওয়ার ইতিহাস থাকে, তাহলে ধরে নেওয়া যায় তর হাঁপানি রয়েছে।

বিশ্ব হাঁপানি দিবসের স্লোগান হলো নিজের হাঁপানি নিজেই নিয়ন্ত্রণ করুন। অর্থাৎ একজন রোগীর পক্ষে তাঁর হাঁপানির উপসর্গগুলো সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আর এটি তখনই সম্ভব, যখন একজন রোগীর তাঁর রোগ, ওষুধ, উত্তেজক, ওষুধ ব্যবহারের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং এই রোগের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকবে। গবেষণায় দেখা গেছে, একজন অ্যাজমা রোগী যদি নিয়মিত ভাবে হাঁপানি প্রতিরোধক ওষুধ নিয়মিত তিন থেকে পাঁচ বছর ব্যবহার করেন, তাহলে ৮০ শতাংশ এই রোগ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ওষুধের মাত্রা সাধারণত উপসর্গের কমে গেলে ধীরে ধীরে ওষুধের পরিমাণ কমিয়ে আনতে হয়। কখনোই হঠাৎ করে কমানো উচিত নয়।

যাদের বংশগত হাঁপানি রোগ আছে তাদের ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিক ধাতুগত চিকিৎসা বিশেষভাবে ফলপ্রসূ। ▯

পঞ্জাবের কৃষক নেতাদের আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের স্বার্থবিরোধী

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকরা পঞ্জাবের কৃষি আন্দোলনে সমর্থন দেওয়ার আগে নিজের রাজ্যটা নিয়ে একটু ভাবুন। এই রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে যে সম্ভাবনা আছে, তাকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকের অবস্থার উন্নতি করা যায় সে নিয়ে ভাবুন। পঞ্জাবের কৃষকদের আন্দোলনে আমাদের কেনো স্বার্থ নেই, বরং তা আমাদের স্বার্থহানির কারণ হতে পারে।

দীপ্তাস্য যশ

পঞ্জাব আর হরিয়ানার 'চাষিরা' কৃষক আন্দোলন করছে। কীসের স্বার্থে? কৃষকদের স্বার্থে? এই কৃষক কারা? এই আন্দোলনে কি পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের স্বার্থও রক্ষিত হবে? নাকি তাদের কৃষকদের মূল্যে পঞ্জাব, হরিয়ানার এইসব জোতদার, জমিদারদের স্বার্থরক্ষা হবে এই আন্দোলনে?

এইসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে কয়েকটি বিষয় একটু আলোচনা করা যাক। সেই আলোচনা থেকেই উত্তরটি উঠে আসবে।

প্রথমত নতুন যে কৃষি বিল সংসদে পাশ হয়েছে তার মূল কথাগুলি একটু দেখে নেওয়া যাক—

কৃষিবিলে প্রস্তাবিত নিয়মগুলি চালু হলে কৃষক তার ফসল বিক্রির জন্য APMC মান্ডি ছাড়াও খোলাবাজারে ফসল বিক্রির সুবিধা পাবে। তার জন্য কৃষককে কোনো ট্যাক্স বা সেস দিতে হবে না। APMC বন্ধ হবে না, কিন্তু তাকে খোলা বাজারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হবে। ঠিক যেমন ব্যাঙ্ক, ইনস্যুরেন্স বা টেলিকমের ক্ষেত্রে প্রাইভেট সেক্টরের সঙ্গে সরকারি সংস্থাগুলিকে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অবতীর্ণ হতে হয়েছে।

এই আইনের কারণে সরকার নির্ধারিত সর্বনিম্ন সহায়ক মূল্য কৃষিপণ্য কেনার ব্যবস্থা বন্ধ হবে না। এই পরিবর্তনের ফলে চাষি সরাসরি কর্পোরেট সংস্থা বা এক্সপোর্টারকে নিজের ফসল বিক্রি করতে পারবে বা তাদের সঙ্গে চুক্তি করতে পারবে। এমনকী নিজের রাজ্যের বাইরে অন্য রাজ্যেও চাষি সরাসরি ফসল বিক্রি করতে পারবে।

এই হলো মূল কথা। অর্থাৎ এই আইনের ফলে একদিকে যেমন চাষির সরাসরি রিটেল সার্ভিস প্রোভাইডার বা খুচরো বিক্রেতার সঙ্গে সরাসরি চুক্তির রাস্তা খুলে দেওয়া হয়েছে, অপরদিকে তেমনই মজুতদারি আইনে ছাড়ের ফলে কৃষিভিত্তিক পরিকাঠামো ব্যবস্থায় বেসরকারি লগ্নিও আহ্বান করা হয়েছে।

এবার যে বিষয়টি উঠে আসছে তা হলে এই, যে আইন কেন্দ্রীয় সরকার চালু করল তা কী একেবারেই নতুন এবং অপ্রত্যাশিত? তা একেবারেই নয়। কারণ চুক্তি চাষের সুবিধার জন্য অনেক রাজ্যই ইতিমধ্যে কৃষি আইনে পরিবর্তন এনেছে। যেমন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০১৪ সালে কৃষি আইনে বেশ কিছু পরিবর্তন আনে। এর ফলে একদিকে যেমন কৃষক সরাসরি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করার ক্ষমতা পায়, তেমনই বিভিন্ন সংস্থা তারা সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ফসল কিনে তা বাজারে বিক্রয় করতে পারে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশের জন্য যে আইন এখন প্রযোজ্য করল তা ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে চালু আছে।

এবার আসি পঞ্জাবের কথায়। পঞ্জাব সরকার তাদের প্রকাশিত তথ্যে জানাচ্ছে শুধু ২০০৭-২০০৮ সালেই সে রাজ্যে চুক্তি চাষের আওতাধীন জমির পরিমাণ ৯৫৩২১ হেক্টর। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গেরও আগে পঞ্জাবে এই চুক্তি চাষ চালু হয়েছে।

চুক্তি চাষের এই তথ্যটি তুলে ধরার একটিই কারণ বারান্দার টবে আলুর চাষ করা যেসব বামবন্ধুরা আমাদের প্রতিনিয়ত সাবধান করছেন যে চুক্তি চাষ চাষির জন্য এক ভয়ংকর ব্যবস্থা। এর ফলে নীলচাষ পরিস্থিতির প্রত্যাবর্তন ঘটবে সেই সব বন্ধুদের একটু আশ্বস্ত করা। তাদের জানানো যে চুক্তি চাষ এই দেশে এবং আমাদের রাজ্যে এমনকী পঞ্জাবেও বহু আগে থেকে চালু আছে এবং এখনও নীল চাষ চালু হয়নি। বরং চাষিরা ক্রমশ চুক্তি চাষেই আগ্রহী হচ্ছে। এর মূল কারণ ফসলের দামের নিশ্চয়তা। একটু উদাহরণ দিই তাহলেই বোঝা যাবে।

২০১৮-১৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে আলু উৎপাদন হয়েছিল মোটামুটি ৯০-৯২ লক্ষ

মেট্রিক টন। সর্বোচ্চ দাম পাওয়া গেছিল মোটমুটি ৯০০ টাকা বস্তা। জ্যোতি আলুর ক্ষেত্রে। চন্দ্রমুখীর ক্ষেত্রে প্রায় ১১০০ টাকা। তাও এই দাম পাওয়া গেছে যারা কোল্ডস্টোরেজে সাত মাস রাখতে পেরেছেন, সেই আর্থিক সামর্থ্য যে চাষিদের ছিল। যারা পারেননি তারা মাঠ থেকেই জ্যোতি আলু বেচেছিলেন মোটামুটি ২৬০ টাকা বস্তা হিসেবে। এক বস্তায় মোটামুটি ৫০ কিলো আলু থাকে।

২০১৯-২০২০ সালে আলু চাষ হয়েছে আরও কম। প্রায় ৯০ লক্ষ টন। কিন্তু এবারে মাঠ থেকে জ্যোতি আলুর দাম পাওয়া গেছে ৫৬০ টাকা মতো। সেই আলুই বাজারে ৪৫-৫০ টাকাতেও বিকিয়েছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে দুই বছরেই ১১০ লক্ষ মেট্রিক টন অর্থাৎ সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতার থেকে অনেক কম উৎপাদন হলেও একবার চাষি দাম পেয়েছে, আরেকবার পায়নি। এই অনিশ্চয়তার কারণেই চাষিরা ক্রমশ চুক্তি চাষের দিকে ঝুঁকছে।

পশ্চিমবঙ্গে এখন জ্যোতি ও চন্দ্রমুখী আলুর পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে চাষ হচ্ছে পেপসি আলু। এই আলু পেপসি কোম্পানি বরাত দিয়ে চাষ করায় তাদের পটেটো চিপসের জন্য। বীজ তারাই দেয়, আর চাষ হয়ে গেলে নির্ধারিত দামে ফসল কিনে নেয়। এক্ষেত্রে চাষিরও সুবিধা। কারণ চাষির কাছে দামের নিশ্চয়তা থাকে। একটা পুরনো হিসাব দেখলেই কীভাবে পেপসি আলুর চাষ পশ্চিমবঙ্গে বাড়ছে তার আন্দাজ পাওয়া যাবে। ২০০৮-০৯ সালে যেখানে প্রায় ১১ হাজার টন পেপসি আলুর চাষ হয়েছিল, ২০১০-১১ সালে সেখানে প্রায় ২২০০০ টন পেপসি আলুর চাষ হয়। 'চুক্তি চাষের বিরোধী' বামেদের বোঝার সুবিধার জন্য বাম আমলেরই হিসাব দিলাম। বর্তমানে প্রায় ১১০০০ চাষি, ৯৫০০ একর জমিতে পেপসি আলুর চাষ করেন। হিসাব মেলালে দেখা যাচ্ছে জ্যোতি আলুতে যদি চাষি প্রতি বিঘায় ৪০০০-৫০০০ টাকা লাভ করে, পেপসি আলুতে প্রায় ১৭০০০ টাকা লাভ প্রতি বিঘায়। সেই সঙ্গে ন্যূনতম মূল্যের নিশ্চয়তা তো রয়েইছে।

সারা ভারতের কৃষকরা প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধির অর্থ ইতিমধ্যে কয়েকটি কিস্তিতে পেয়েছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা এখনও কোনো টাকাই পাননি। কারণ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধির বিরোধিতা করে এসেছেন। ভোটের মুখে মুখ্যমন্ত্রী মত পাল্টালেও কৃষকদের বিশদ তথ্য কেন্দ্রীয় সরকারকে জমা দেননি। পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের কপালে কী আছে ভগবানই জানেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে চুক্তি চাষ অতটাও খারাপ নয় বা চাষিদের কাছে অতটাও অপছন্দের নয় যেমনটা বামেরা বলে এবং চুক্তি চাষের জেরে চাষি লাভবানই হচ্ছে। আর সেই চাষিদের জমির মালিকও পেপসি কোম্পানি হয়ে যায়নি এখনও। অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রের কৃষি আইনের বিরোধিতা করে বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ করেছে। জানার ইচ্ছা রইল এক্ষেত্রে কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের ২০১৪ সালে করা পরিবর্তনেরও বিরোধিতা করবে বা চুক্তি বন্ধ করতে চাইবে?

অর্থাৎ পরিষ্কার ভাবেই দেখা যাচ্ছে কৃষি আইনের মূল বিরোধিতার জায়গাটি চুক্তি চাষ নয়। চুক্তি চাষ দেশে বহু আগে থেকেই চালু আছে এমনকী সেই চাষের পরিমাণ দিনে দিনে বাড়ছেও। চাষি লাভবান হওয়ার কারণেই এই পরিমাণ বাড়ছে। চাষি ক্ষতিগ্রস্ত হলে নিশ্চয় চুক্তিতে আগ্রহী হতো না। তাহলে মূল বিরোধিতার জায়গা কোনটি?

দেখবেন কৃষক আন্দোলনের যেসব নেতারা আছেন তারা যা বলছেন তার মূল বক্তব্য বিষয় এপিএমসি আইন এবং ন্যূনতম সহায়ক মূল্য। এই দুটি জায়গা নিয়েই এদের চিন্তা। কেন এই দুটি বিষয় নিয়ে এদের এতো চিন্তা এবং এই দুটি বিষয় কীভাবে একে অপরের সঙ্গে জড়িত তাও একটু দেখে নেওয়া যাক। অবশ্য এই আলোচনায় বামেদের টানব না। কারণ বামশাসিত কেরলেই এপিএমসি আইন নেই। কাজেই এই নিয়ে ওদের সমালোচনা করার কোনো জায়গাও নেই।

এপিএমসি নিয়ে অন্য কিছু বলার আগে কিছু তথ্য দেখে নেওয়া যাক। কেন্দ্রীয় আইনে বলা হয়েছে কোনো রাজ্য এপিএমসি আইনের আওতায় চাষিদের কাছ থেকে কোনো ট্যাক্স বা সেস নিতে পারবে না। পঞ্জাবে এই ট্যাক্সের পরিমাণ ৮.৫ শতাংশ। বিভিন্ন মান্ডি থেকে এ বাবদ পঞ্জাব সরকারের ২০১৯-২০২০ সালে আয় প্রায় ৩৬০০ কোটি টাকা। এছাড়াও ফুড কর্পোরেশান অব ইন্ডিয়া পঞ্জাব থেকে যে ফসল কেনে তার জন্য লাইসেন্সড এজেন্টদের ২.৫ শতাংশ কমিশন দেয়। পঞ্জাবের প্রায় ৩৬০০০ কমিশন্ড এজেন্ট এ বাবদ প্রায় ১৬০০ কোটি টাকা আয় করেন।

কেন্দ্র সরকারের তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে এফসিআই ২০১৯- ২০২০ সালে পঞ্জাব থেকে প্রায় ১০৮.৭৬ মেট্রিক টন ধান কিনেছে। সে তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেনা হয়েছে মাত্র ১৮.৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন। অন্ধ্র থেকে কেনা হয়েছে ৫৫.৩৩ লক্ষ

মেট্রিক টন। তেলেঙ্গানা থেকে কেনা হয়েছে ৭৪.৫৪ লক্ষ মেট্রিক টন ও উত্তর প্রদেশ থেকে ৩৭.৯০ মেট্রিক টন। সব থেকে বেশি ধান কেনা হয়েছে পঞ্জাব থেকে। অথচ উৎপাদনের দিক থেকে দেখলে দেখা যাচ্ছে সারা ভারতে যত ধান উৎপাদন হয় পঞ্জাব তার ১১ শতাংশই উৎপাদন করে। সব থেকে বেশি উৎপাদন করে পশ্চিমবঙ্গ। ভারতের মোট উৎপাদনের ১৩.৭৯ শতাংশ। অর্থাৎ এফসিআই যখন ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান কিনছে তখন সব থেকে বেশি কেনা হচ্ছে পঞ্জাব থেকে। এফসিআই- এর সঙ্গে যদি অন্যান্য সরকারি এজেন্সিগুলোর ক্রয় পরিমাণ যোগ করা হয় তাহলে দেখা যাবে পঞ্জাব থেকে ধান কেনা হচ্ছে ১৬২.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন। সে তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে সব এজেন্সি মিলিয়ে ক্রয়ের পরিমাণ মাত্র ২৭.০৩ লক্ষ মেট্রিক টন। অর্থাৎ ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের সবথেকে বেশি সুবিধা পাচ্ছে পঞ্জাব। এমনকী গত বছর দেখা গেছে পঞ্জাবে যা ধান উৎপাদন হয়েছে তার থেকে বেশি এপিএমসি-তে বিক্রি হয়েছে। এই বাড়তি ধানের পুরোটাই গেছে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ থেকে। যেখানে ছোটো কৃষকের সংখ্যা বেশি। যেখানে মান্ডি ব্যবস্থা দুর্বল। যেখানে কৃষকের ফসল মজুত করার ক্ষমতা নেই।

এখন প্রশ্ন হলো পঞ্জাবের কৃষকরা যদি সারা দেশের কৃষকদের স্বার্থে আন্দোলন করেন তাহলে তারা কী মেনে নেবেন যে প্রতিটি রাজ্যের উৎপাদনের অনুপাত অনুযায়ীই বিভিন্ন সরকারি এজেন্সির ক্রয়ের পরিমাণ নির্ধারিত হোক? অর্থাৎ পঞ্জাব যদি সব থেকে বেশি গম উৎপাদন করে তাহলে এফসিআই সব থেকে বেশি গম কিনবে পঞ্জাব থেকে আর পশ্চিমবঙ্গ যদি সব থেকে বেশি ধান উৎপাদন করে তাহলে এফসিআই সব থেকে বেশি ধান কিনবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। মনে হয় না আন্দোলনের নেতারা এই প্রস্তাবে রাজি হবেন? যদি হন সেক্ষেত্রে না হয় এপিএমসি নিয়ে কেন্দ্র তার অবস্থান বদলাক এমনটা আমরাও চাইব। অর্থাৎ এই আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকের কোনো স্বার্থই রক্ষিত হচ্ছে না। এই আন্দোলন একেবারেই পঞ্জাবের বড়ো কৃষক আর কমিশনড এজেন্টদের স্বার্থের আন্দোলন। তবে এই আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদেরও ভূমিকা আছে। আন্দোলনের টাকার জোগান তারাই দিচ্ছে। কীভাবে?

পশ্চিমবঙ্গে যে আলু চাষ হয় সেই আলুর বীজ আসে পঞ্জাব থেকে। এমনিতে অন্যান্য বছর যেখানে আলুর বীজের দাম থাকে ১৬০০ থেকে ১৮০০ টাকা প্যাকেট, এবছর সেই বীজের দাম ৪৫০০ টাকা থেকে ৫০০০ টাকা প্যাকেট। অর্থাৎ এই আন্দোলনের জন্য যে বাড়তি টাকার প্রয়োজন ছিল তার জোগান দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ছোটো ছোটো চাষিরা।

মুশকিল হলো বাঙ্গালি এমনিতেই বিশ্বমানব। বাঙ্গালি নেতারা বিশেষত বামপন্থী ঘরানার নেতারা আরও বড়ো বিশ্বমানব আর 'কৃষক অন্তপ্রাণ'। তাই তারা সাত তাড়াতাড়ি ছুটেছেন কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন দিতে। ভেবে দেখার দরকারও মনে করেননি যে এতে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা হচ্ছে নাকি স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে। অবশ্য ৩৪ বছরের 'কৃষক বন্ধু' বাম সরকার আর তারপরের 'কৃষক বন্ধু' তৃণমূল সরকার পশ্চিমবঙ্গের কৃষির যা হাল করেছে তা আর কহতব্য নয়।

এতদিনেও তারা পশ্চিমবঙ্গে একটা উচ্চফলনশীল আলুর বীজ তৈরি করতে পারেননি। তার জন্য এখনও চাষিরা পঞ্জাবের উপরেই নির্ভরশীল। এবার যদি সেচ ব্যবস্থার দিকে তাকাই তাহলে দেখা যাবে পঞ্জাবে যেখানে মোট কৃষি জমির ৯৮ শতাংশই সেচের আওতাভুক্ত, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ৫১ শতাংশ জমি সেচের আওতাভুক্ত। শুধু এই নয়, আগে পশ্চিমবঙ্গের ৮.৮৬ লক্ষ হেক্টর কৃষিজমি ক্যানাল ইরিগেশান অর্থাৎ খালের জলের আওতায় ছিল, এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে ৫.৬ লক্ষ হেক্টর। একটি নদীপ্রধান রাজ্যে ক্যানাল ইরিগেশানের এই অবস্থা সত্যিই দুঃখজনক। প্রধানমন্ত্রী কৃষি যোজনার ফলে যেখানে অন্যান্য রাজ্যে সেচের আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ বাড়ছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে উলটো চিত্র। শুধুমাত্র সুস্পষ্ট জমি অধিগ্রহণ নীতি এবং সদিচ্ছার অভাব এর কারণ। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বর্ষে নতুন ৮.৪ লক্ষ

কৃষিপণ্য বিপণন এবং বাণিজ্য বিল, ২০২০

কীভাবে মিথ্যে প্রচার চলছে	কী রয়েছে এই কৃষি বিলে
১. (ক) কৃষকেরা সর্বনিম্ন সহায়ক মূল্য পাবেন না।	সর্বনিম্ন সহায়ক মূল্য থাকবে। বস্তুত, মোদী সরকার সর্বনিম্ন সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি করেছে এবং সেই বর্ধিত হারে আগের থেকে অনেক বেশি শস্য কৃষকদের কাছ থেকে কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
(খ) সর্বনিম্ন সহায়ক মূল্য-নির্ভর ক্রয়পদ্ধতি উঠে যাবে।	নতুন আইনের ফলে সর্বনিম্ন সহায়ক মূল্য কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া সর্বনিম্ন সহায়ক মূল্যের মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে শস্য কেনে রাজ্যের বিভিন্ন এজেন্সি। নতুন আইনে এই ব্যবস্থা বজায় থাকবে।
(গ) সর্বনিম্ন সহায়ক মূল্য প্রদান ব্যবস্থা শেষ হয়ে যাবে।	সর্বনিম্ন সহায়ক মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে শস্য কেনা এই সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এই ব্যবস্থা বজায় থাকবে।
২. কৃষিপণ্য বিপণন এবং বাণিজ্য আইনের জন্য রাজ্যের এপিএমসি আইন উঠে যাবে। ফলে রাজ্যের কৃষিমান্ডি আর থাকবে না।	কেন্দ্রের আইন চালু হলেও রাজ্যের এপিএমসি আইন এবং কৃষিমান্ডি উঠে যাবে না। এই নতুন কৃষি-আইনের উদ্দেশ্য, রাজ্যের মান্ডিগুলির বাইরে সারা দেশের যে বৃহত্তর বাজার পড়ে আছে তার সুবিধা কৃষকদের দেওয়া।
৩. এই আইন চালু হলে কৃষিক্ষেত্রে রাজ্য আর কোনও আইন করতে পারবে না। রাজ্যের ক্ষমতা হ্রাস পাবে।	আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের বিষয়টি সংবিধানের কেন্দ্রীয় তালিকায় ৪২ ধারায় রয়েছে। রাজ্য তালিকার ২৬ ধারায় আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের কথা থাকলেও, সংবিধান যুগ্ম তালিকার ৩৩ ধারায় কেন্দ্রকেও এ বিষয়ে আইন প্রণয়নের অধিকার দিয়েছে। সুতরাং নতুন কৃষি আইন কোনও ভাবেই রাজ্যের ক্ষমতা খর্ব করে না।
৪. (ক) নতুন কৃষি আইনে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। (খ) এই আইন চালু হলে কর্পোরেট কোম্পানিগুলো কৃষকদের শোষণ করবে।	এই আইনে কৃষকদের স্বার্থ সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে কোনও সমস্যা দেখা দিলে নামমাত্র খরচে দ্রুত ও সহজসাধ্য পদ্ধতিতে মীমাংসার ব্যবস্থা রয়েছে আইনে। স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কৃষকের কাছ থেকে কৃষিপণ্য কেনার পর সেইদিন অথবা তিনটি কাজের দিনের মধ্যে দাম মিটিয়ে দিতে হবে ক্রেতাকে।
৫. (ক) এই আইনে কৃষিপণ্য বিক্রি করে তার দাম পাওয়ার কোনও গ্যারান্টি নেই। (খ) এপিএমসি-র বিধিবদ্ধ দালালেরা এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য এবং তাদের কাছ থেকে টাকা আদায়ে কোনও সমস্যা নেই।	কৃষিপণ্য কিনে সেইদিন অথবা তিনটি কাজের দিনের মধ্যে দাম মিটিয়ে দিতে হবে ক্রেতাকে। এর অন্যথা হলে অভিযুক্ত ক্রেতার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। একজন চুক্তিভঙ্গকারীর জন্য আইনে যে ব্যবস্থা আছে অভিযুক্ত ক্রেতার ক্ষেত্রেও একইরকম ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।
৬. (ক) মান্ডি থেকে রাজস্ব বাবদ আয় কমে যাবে।	রাজ্য এবং এপিএমসি-র ক্ষমতা খর্ব হবে না এবং নির্দিষ্ট বাজার ক্ষেত্রের মধ্যে তারা আগের মতো রাজস্ব (মান্ডি ফি) আদায় করতে পারবে।
(খ) কৃষিক্ষেত্র থেকে রাজ্যের প্রাপ্য রাজস্ব কমে যাবে এবং মান্ডি-ব্যবস্থা বিলোপ করে কর্পোরেটের একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠিত হবে।	সরকারি মান্ডির পাশাপাশি এই আইনে বেসরকারি মান্ডি ব্যবস্থা তৈরি করার প্রস্তাব রয়েছে। তাতে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সঙ্গে কৃষকদের পণ্য বিক্রি করার বাজার আরও বড়ো হবে। রাজ্যগুলি আগের থেকে বেশি রাজস্ব আয় করতে পারবে।

হেক্টর আর ২০১৭-২০১৮ সালে নতুন ৯.২১ লক্ষ হেক্টর কৃষিজমি চলে আসে কৃত্রিম সেচের আওতায়। অবাক করার কথা হলো পশ্চিমবঙ্গের মতো কৃষিপ্রধান রাজ্যে ওই দুই অর্থবর্ষে মাত্র ৫১১৮০ হেক্টর জমি নতুন ভাবে সেচের আওতায় আসে আর ওই দুই অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ৩৮.৫০ এবং ৪৮ কোটির একটা বড়ো অংশ ফেরত চলে যায়। সেচের এই দুরবস্থার ফলেই কৃষক বাধ্য হয়ে জলের জন্য সাবমার্সিবল পাম্পের উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। জল কিনে তাকে চাষ করতে হচ্ছে। আর তার জন্য তাকে নির্ভরশীল হতে হচ্ছে বড়ো ব্যবসায়ীদের উপরে। কারণ ছোটো কৃষকের ক্ষমতা নেই দুই আড়াই লক্ষ টাকা খরচ করে বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ে সাবমার্সিবল পাম্প বসানোর। শুধু সেচ ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই নয়, কিষান ক্রেডিট কার্ড বিলির ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। ৫০ শতাংশ কৃষকের কাছেই যেহেতু কিষান ক্রেডিট কার্ড নেই, ফলে তারা কৃষি লোনের সুবিধাও নিতে পারে না। ২০১৮-১৯ সালে ব্যাঙ্কগুলি কৃষি লোনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছিল ৬৪ হাজার কোটি টাকা, কিন্তু মাত্র ৪৬ হাজার কোটি টাকারই লোন ডিসবার্স করা সম্ভব হয়। কারণ অধিকাংশ কৃষকের কাছেই কিষান ক্রেডিট কার্ড নেই। ফলে কিষান ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে যে বিভিন্ন ভরতুকি তারা পেতে পারে তাও পাচ্ছে না।

গত ৪৪ বছরে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ব্যবস্থার অবস্থা খারাপ থেকে খারাপতর হয়েছে। যে রাজ্যের অধিকাংশ চাষিই ছোটো চাষি, যাদের গড় জমির পরিমাণ ২ হেক্টরেরও কম সেখানে কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন এবং উপার্জন বাড়ানোর জন্য উন্নত সেচ এবং মান্ডি ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন। অথচ দুটি ক্ষেত্রেই আমরা বহু পিছিয়ে।

২০১৬ সালের ১৪ এপ্রিল কেন্দ্রীয় সরকার বাজারে আনে 'ইলেকট্রনিক ন্যাশনাল এগ্রিকালচার মার্কেট' বা সংক্ষেপে 'ইমাম'। ঠিক হয় প্রারম্ভিক ভাবে আটটি রাজ্যের ২৩ রকমের উৎপাদিত সামগ্রী নিয়ে দুশোটি কিষান মান্ডিকে অনলাইনে যুক্ত করা হবে জাতীয় বাজারের সঙ্গে। ঠিক হয় একটাই লাইসেন্সে একই দামে একই জিনিস বিক্রি করবে সারা দেশে চাষিরা। পুরোটাই হবে অনলাইনে। সে উপলক্ষ্যে পরিকাঠামো গড়ে তুলতে প্রত্যেক মান্ডিকে ৩০ লক্ষ করে টাকা ও বিনা পয়সার সফটওয়ার দেওয়া হয়। ঠিক হয় ২০১৭ সালের মার্চ অব্দি ৪০০ মান্ডি এবং ২০১৮ সালের মার্চ অব্দি ৫৮৫ মান্ডিকে যুক্ত করা হবে ইমামের সঙ্গে। এতে একদিকে যেমন দুর্নীতি কমবে অন্যদিকে ফসলের সুষ্ঠ বণ্টন ও সামগ্রিক চাহিদার ফলে কৃষকরা ভালো দাম পাবে ফসলের। কিন্তু দুর্ভাগ্য, অন্য আরও অনেক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের মতোই ইমামও মুখ থুবড়ে পড়েছে ভাগীরথীর তীরে এসে। ঠিক এই সময় যখন ইউপির ১০০, গুজরাটের ৭৯, মহারাষ্ট্রের ৬০, তেলেঙ্গানার ৪৭, মধ্যপ্রদেশের ৫৮ এবং হরিয়ানার ৫৪টি কিষান মান্ডি-সহ রমরমিয়ে চলছে ষোলোটি রাজ্য ও দুটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের ৫৮৫টি কিষান মান্ডি, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে ইমামের সঙ্গে যুক্ত হওয়া কিষান মান্ডির সংখ্যা সবে ১৭। যখন অন্য রাজ্যের কৃষকরা ৩৬২০০ কোটি টাকার ব্যাপক কৃষি বাজারের সুবিধা নিচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে তখন আগাছায় ভরে উঠছে বহু কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত অসংখ্য নীল সাদা কৃষক বাজার।

এরকম আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। কিন্তু তাতে প্রতিবেদন দীর্ঘ হবে। আর আমাদের রাজ্যে তো রাজনীতির কারণে কৃষককে তার প্রাপ্য টাকা থেকেও বঞ্চিত করা হয়। এখন ভোটের ঠেলায় পরে কৃষি সম্মান নিধি যোজনা চালু করছে বর্তমান সরকার। কাজেই আর উদাহরণ দিচ্ছি না।

কেন্দ্র যে নতুন কৃষি আইন এনেছে এতে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের কোনো স্বার্থহানি হবে না, বরং ভবিষ্যতে তারা লাভবান হতে পারে। যেমন মজুত আইন উঠে যাওয়ার ফলে আগামীদিনে কোল্ডস্টোরেজ এবং কোল্ডচেইনে অনেক বেসরকারি বিনিয়োগের সম্ভাবনা আছে।

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে কোল্ড স্টোরেজ ক্যাপাসিটি বা মোট ফসল মজুতের ক্ষমতা ৫৯ লক্ষ মেট্রিক টনের কিছু বেশি। যা মোট চাহিদার তুলনায় একেবারেই নগণ্য। কোল্ড স্টোরেজের অভাবেই সবজি চাষ লাভজনক হওয়া সত্ত্বেও চাষি তাতে আগ্রহী নয়, কারণ সবজি মজুতের কোনো ব্যবস্থা নেই। আগামীদিনে যদি এই ক্ষেত্রগুলিতে বেসরকারি বিনিয়োগ হয় তাহলে তা ছোটো চাষিদের জন্য বিশেষ সহায়ক হবে। আবার এই যে আলুর বীজের জন্য আমরা পঞ্জাবের উপর নির্ভরশীল সেক্ষেত্রেও বেসরকারি বিনিয়োগ হলে আমাদের পঞ্জাবের উপরে নির্ভরতা কমবে। তবে সর্বাগ্রে প্রয়োজন রাজ্য সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার।

'পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় উন্নত কৃষি শিক্ষা যোজনা'র অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তি ও পদ্ধতির ব্যাপারে শিক্ষিত করার উদ্যোগ নিলেও রাজ্য সরকার তাতে বিশেষ উৎসাহ দেখায়নি। এই যোজনার অধীন কেন্দ্র চারটি বিশ্বমানের কৃষি গবেষণা কেন্দ্র তৈরি করার উদ্যোগ নেয় ২০১৬ সালে। এর একটা পশ্চিমবঙ্গের পাওয়ার কথা থাকলেও শুধুমাত্র জমি সমস্যার মতো ক্ষুদ্র রাজনৈতিক কারণে তা চলে যায় উত্তর প্রদেশে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইউপিতে তখনও যোগী সরকার ক্ষমতায় আসেনি আর রাজনৈতিক বিরোধিতা সত্ত্বেও অখিলেশ যাদব হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে রাজ্যের ক্ষতি করার কথা ভেবেও দেখেননি। আর সেখানে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা! নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্য দৌড়ানো তো দূরের কথা, ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রাসঙ্গিক প্রতিষ্ঠানও রাজনীতির জাঁতাকলে পড়ে নিজের গুরুত্ব হারাতে বসেছে এখন।

তাই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকরা বরং বিশ্বমানব হয়ে পঞ্জাবের কৃষি আন্দোলনে সমর্থন দেওয়ার আগে নিজের রাজ্যটা নিয়ে একটু ভাবুন। এই রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে যে সম্ভাবনা আছে, তাকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকের অবস্থার উন্নতি করা যায় সে নিয়ে বরং ভাবুন। পঞ্জাবের কৃষকদের আন্দোলনে আমাদের কেনো স্বার্থ নেই, বরং তা আমাদের স্বার্থহানির কারণ হতে পারে।

(লেখক বিশিষ্ট সমাজসেবী)

নতুন কৃষি আইনে লাভবান হবেন পশ্চিমবঙ্গের কৃষকেরা

কল্যাণ জানা

আমাদের রাজ্যে বেশিরভাগ কৃষক হলেন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক। এদের জমির পরিমাণ কম। অন্যান্য রাজ্য বিশেষ করে পঞ্জাব ও হরিয়ানার কৃষকদের সঙ্গে আমাদের রাজ্যের কৃষকদের একটা পার্থক্য রয়েছে। মূলত জমির পরিমাণ ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামো প্রভৃতির ক্ষেত্রে। এই নতুন কৃষি আইন লাগু হলে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের কৃষক বন্ধুরা উপকৃত হবেন। তাদের আয় বৃদ্ধি পাবে। একই সঙ্গে তাঁরা আত্মনির্ভর হয়ে উঠবেন। এখানে মধ্যস্বত্বভোগী বা ফড়েদের সংখ্যা অনেক বেশি। কৃষক ও সাধারণ ক্রেতার মাঝে দালাল রয়েছে। রাজ্যের কৃষকরা বাধ্য হন কম দামে উৎপাদিত ফসল ও সবজি বিক্রি করতে ফড়েদের। এই ভাবে ৪-৫ বার ফড়েদের হাত ঘুরে যখন ফসল বা সবজি বাজারে ক্রেতার কাছে আসে তখন তার দাম অনেক। কৃষক কিন্তু তার উৎপাদিত ফসলের সঠিক বা বেশি দাম পেল না। আর অন্যদিকে ক্রেতাকে অনেক বেশি দাম দিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করতে হচ্ছে। এই নতুন কৃষি আইনে কৃষক আর ক্রেতার মাঝে কাটমানিখোর দালালরা থাকতে পারবে না। তাই বিরোধীদের এত আন্দোলন। তারা শুধু বিরোধিতা করার জন্য রাজনীতি করছে। মূলত এই নতুন কৃষি আইন কৃষক-বান্ধব আইন। ঠিক তেমনি জনসাধারণের আইন। ফড়ে বা দালালদের এই আইন খুশি করবে না। রাজ্যের অনেক চাষিভাই কৃষিতে লাভ হচ্ছে না বলে অন্য পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তারা কৃষিকাজ ছেড়ে দিচ্ছেন। কিন্তু এই কৃষি আইন তাদের আবার উৎসাহ প্রদান করে কৃষিকাজে মনোনিবেশ করাবে। কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াকরণের জন্য সাহায্য করা হবে। কৃষি হবে একধরনের শিল্প। আর মান্ডিতে ফসল বিক্রি করার জন্য আগে রাজ্য সরকারকে শুল্ক দিতে হতো। এই কৃষি আইনের ফলে আর দিতে হবে না। ফলে কৃষকদের আয় বাড়বে ও উৎপাদিত ফসলের বেশি ও সঠিক দাম পাবেন। এই আইন লাগু হলেই কৃষি পণ্যের নতুন বাজার খুলে যাবে, যেখানে কৃষকরা বেশি দামে কৃষিজপণ্য বিক্রি করতে পারবেন। রাজ্য সরকার এবং দালাল চক্রের মুনাফা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু কৃষকের উৎপাদিত কৃষিজপণ্যের দাম তুলনামূলক ভাবে বেড়ে যাবে। ফলে পশ্চিমবঙ্গের ছোটো ও মাঝারি চাষিভাইরা আর্থিক দিক থেকে সমৃদ্ধ হবেন।

আমাদের রাজ্যে কিছু বিশেষ রাজনৈতিক দল কেন্দ্রীয় সরকারের এই নতুন কৃষি আইনের বিরোধিতা করছে। বিরোধিতা করা গণতন্ত্রের পক্ষে ভালো। কিন্তু তারা শুধুমাত্র রাজনীতির স্বার্থেই বিরোধিতা করছেন। দেশে পূর্বের কৃষি আইন লাগু হয়েছিল ১৯৫৫ সালে। দেশের তখনকার কৃষির অবস্থা, আর বর্তমানে কৃষির অবস্থা ও উন্নতির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আজ ভারতবর্ষে ফসল উৎপাদন অনেক অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশ আজ কৃষিতে স্বাবলম্বী। তাই ৬৫ বছর আগেকার কৃষিনীতির পরিবর্তন ও সংশোধন করা দরকার। তবেই রপ্তানি বাণিজ্য বাড়বে, আয় বৃদ্ধি পাবে, কৃষি-শিল্পের সুযোগ বাড়বে। ফসলের

জাতীয় চুক্তিচাষ আইন, ২০২০	
মিথ্যে	**সত্যি**
১. কর্পোরেট কোম্পানি কৃষকদের জমি কেড়ে নেবে এবং কৃষকেরা কৃষিশ্রমিকে পরিণত হবেন।	কৃষকের সঙ্গে কর্পোরেটের চুক্তি হবে কৃষিপণ্য কেনাবেচার জন্য। এর সঙ্গে কৃষিজমির কোনও সম্পর্ক নেই। এই আইন কোনওভাবেই কৃষিজমি হস্তান্তর বা বিক্রি করা কিংবা লিজ বা বন্ধক রাখাকে মান্যতা দেয় না। স্পষ্ট বলা হয়েছে, কোনও ক্রেতা/ক্রেতার পৃষ্ঠপোষক/কর্পোরেট কৃষকের জমিতে মালিকানা কায়েম করতে পারেন না।
২. কৃষক এবং কর্পোরেটের মধ্যে কোনও সমস্যা দেখা দিলে এই আইনে কৃষকদের কোনও রক্ষাকবচ নেই।	চুক্তি খেলাপি কর্পোরেটের বিরুদ্ধে কীভাবে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া যাবে তার স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে আইনে। ইতিমধ্যেই এই ব্যবস্থা নিয়ে অনেক কৃষক সাফল্য পেয়েছেন। চুক্তিচাষ পদ্ধতিতে কৃষকের জমি সম্পূর্ণ সুরক্ষিত।
৩. এই আইনে কৃষিপণ্যের দামের কোনও গ্যারান্টি নেই।	আইনে স্পষ্ট বলা হয়েছে, যে-দামে কৃষিপণ্য বিক্রি করা হবে তা চুক্তিতে পরিষ্কার উল্লেখ করতে হবে। আরও বলা হয়েছে, বাজারে যদি দামের তারতম্য ঘটে তাহলে পরিবর্তিত দাম কৃষককে দেবার গ্যারান্টি দিতে হবে ক্রেতাকে। যদি ক্রেতা প্রতিশ্রুত দাম না দেন তাহলে বকেয়ার দেড় গুণ তাকে চুক্তিখেলাপের শাস্তিস্বরূপ দিতে হবে। ইতিমধ্যেই অনেক কৃষক এই টাকা পেয়েছেন।
৪. চুক্তির নামে কর্পোরেট কৃষকদের শোষণ করবে।	এই চুক্তি কৃষককে কৃষিপণ্যের বাঁধা দাম দেওয়ার গ্যারান্টি দেয়। কৃষক চাইলে যে কোনও সময় চুক্তি থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু কর্পোরেট হাউজ পারবে না।
৫. চুক্তিভিত্তিক চাষ ভারতে কখনও হয়নি।	পঞ্জাবে অনেকদিন ধরেই চুক্তিচাষ চলছে। পেপসিকো কোম্পানি পঞ্জাব-সহ বিভিন্ন রাজ্যে চুক্তির ভিত্তিতে আলুচাষ করছে। কৃষকরা ভালো দাম পাচ্ছেন।

অপচয় রোধ করা সম্ভব হবে। এই রাজনৈতিক দলগুলির বিরোধিতা করার ধরন ও যুক্তি আলাদা। এরা কোনোদিন কৃষকের উন্নতির কথা ভাবেনি ও বলেনি। শুধুমাত্র কৃষকদের নিয়ে রাজনীতি করেছে। কৃষকদের হাতের মুঠোয় রেখে তাদের প্রকৃত অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। স্বাধীনতার পর এতগুলি বছর পার হয়ে গেল। এই বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি কোনোদিনের জন্য পূর্বের কৃষি আইনের পরিবর্তন বা সংশোধনের জন্য আওয়াজ তোলেনি। আসলে এরা কৃষকের উন্নতি ও আয় বৃদ্ধি চায় না।

কংগ্রেস সরকার ৩০ বছর শাসন করেছে। তারা কৃষি আইন সংশোধনের কথা বলেনি। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ৩৪ বছর ক্ষমতায় থাকলেও কৃষি আইন পরিবর্তন ও সংশোধনের কথা তোলেনি। এমনকী কৃষকের আয় বৃদ্ধির ব্যাপারে পদক্ষেপ করেনি। আমাদের রাজ্যের বর্তমান শাসকদলের কথা বাদ দিলাম। বেশিরভাগ মান্ডিতে চলে সিন্ডিকেট রাজ। বিরোধীরা কৃষিবিলকে রাজনৈতিক ইস্যু করে আন্দোলন করছে। তাহলে তারা কেন এতদিন তা আইনের আওতায় আনলো না? যেই কেন্দ্রীয় সরকার আইন রূপে পাশ করেছে— সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গি আন্দোলন শুরু। কিছু কৃষককে সামনে এগিয়ে দিয়েছে। এরা সাধারণ কৃষক সমাজের প্রতিনিধি নয়। এই নতুন কৃষি আইনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের শুধুমাত্র কৃষকের নয়, ক্রেতার লাভ হবে। রাজ্যের বিভিন্ন মান্ডিতে যারা এতদিন দালালি করে কৃষকের উৎপাদিত কৃষিজপণ্যে নিজেদের আয় বাড়াতো, কাটমানিতে ফুলে ফেঁপে উঠতো তাদের আয়ের রাস্তা বন্ধ হবে, এই আইন পণ্য বিক্রির সুযোগ বাড়াতে সহায়তা দেবে। রাজ্যের মান্ডি বা কৃষি-বাজারে যেভাবে কৃষকেরা শোষিত হয়, প্রতারিত হয়, তা থেকে মুক্তির সম্ভাবনা তৈরি করবে এই নতুন কৃষি আইন। পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা মূলত ধান, ডাল ও তৈলবীজ ফসল এবং সবজি উৎপাদন করে থাকেন। এই নতুন কৃষি আইনের ফলে ফড়ে বা দালালদের হাত থেকে বাঁচবেন। তাদের উৎপাদিত কৃষিজ-পণ্যের সঠিক দাম পাবেন।

নতুন কৃষি বিলে যে চুক্তি ভিত্তিক চাষ পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে--- তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের ছোটো ও মাঝারি চাষিভাইরা অবশ্যই উপকার পাবেন। বামফ্রন্টের নেতারা চুক্তি ভিত্তিক চাষ নিয়ে প্রতিবাদ করছেন এবং ইংরেজ আমলের নীল চাষের সঙ্গে তুলনা করছেন। রাজ্যের বর্তমান শাসক দলের নেতারাও একই পথে হাঁটছেন। তবে বলে রাখি— চুক্তি ভিত্তিক চাষ পদ্ধতি নতুন হয়। রাজ্যের অনেক জেলায় বিশেষ করে হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া, বাঁকুড়া, উত্তর ২৪ পরগনা প্রভৃতি জেলায় বহু কৃষকবন্ধু বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে ফসলের জন্য চুক্তি ভিত্তিক চাষ করে থাকেন। এবং তারা লাভবান হন। উন্নত ও গুণমান যুক্ত আলু উৎপাদনের ক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক চাষ পদ্ধতি হয়ে থাকে। এই নতুন কৃষি বিলের ফলে তা আইনে রূপ নিয়েছে। এতে আখেরে লাভ

পশ্চিমবঙ্গে চুক্তিচাষ

পশ্চিমবঙ্গে চুক্তিচাষ শুরু হয়েছিল বামফ্রন্টের আমলে। মেট্রো ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন কৃষকেরা। দক্ষিণ কলকাতায় এদের বিশাল শোরুম আছে। স্থানীয় মানুষজনের বক্তব্য, এখানে বাজারের থেকে শস্তায় পাওয়া যায় কাঁচা আনাজ। চুক্তিবদ্ধ চাষিরাও ভালো দাম পান। মূলত আলুচাষিদের সঙ্গে চুক্তি করে বিখ্যাত সফ্‌টড্রিঙ্ক প্রস্তুতকারক পেপসিও আলু চাষ করাচ্ছে। এই আলু লাগে পোটাটো চিপস তৈরি করার জন্য। এমনই এক চুক্তিবদ্ধ চাষি কার্তিক নন্দী। থাকেন হুগলী জেলার গোঘাট ব্লকের আনন্দপুর গ্রামে। তিনি মোট চার বিঘা জমিতে প্রতি বিঘায় ৯০-১১০ বস্তা আলু উৎপাদন করেন। এই আলু 'প্রোসেস গ্রেডে'র অর্থাৎ আলটান্টিক, এফসি ৩ এফসি ৫ গোত্রের। লাভ থাকে প্রতি বিঘায় ১৭,০০০-২০০০০ টাকা অর্থাৎ বস্তায় ১৭০-২০০ টাকা। কার্তিকবাবুর সাফ কথা, 'আমি আর কোনওভাবেই সাধারণ আলু চাষ করব না। ওতে চাষের খরচ ওঠে না।'

হবে রাজ্যের কৃষকের। কারণ ফসলের দাম আগে থেকেই নির্ধারিত হবে। চুক্তি হবে ফসলের জন্য। জমির সঙ্গে কোনো প্রকার চুক্তি হবে না। কৃষকদের দেওয়া হবে উন্নত প্রযুক্তি, পদ্ধতি, উন্নতমানের জাতের বীজ এবং কৃষি-প্রশিক্ষণ।

এই সমস্ত কাজের জন্য কৃষকরা ব্যাঙ্ক থেকে কম সুদে ঋণ নিতে পারবেন। চুক্তিভিত্তিক চাষ পদ্ধতি চালু হলে রাজ্যের আলু, বেগুন, পেঁয়াজ, টমাটো প্রভৃতি সবজি গুণমান ফসল/শস্য উৎপাদনকারী কৃষকবন্ধুরা নতুন দিশা দেখতে পাবেন। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কন্ট্রাক্ট ফার্মিং-এর বিরোধিতা করেছেন। তারা কৃষকদের ভুল কথা বলছেন। পশ্চিমবঙ্গের অনেক কৃষকবন্ধু কন্ট্রাক্ট ফার্মিং করে তাদের আয় বাড়িয়েছেন। কয়েকদিন আগেই কয়েকটি জেলায় চাষিভাইদের মাঠ পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। আলু উৎপাদনকারী চাষির সঙ্গে কথা বললাম। পাইকারি দরে ৩.৭০ টাকা প্রতি কেজি আলু কৃষকবন্ধু বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। পরে আমাদের সেই আলু ৩০-৪০ টাকা কেজি প্রতি ক্রয় করতে হবে। চাষিরা ফসলের ভালো দাম পাচ্ছে কোথায়? আসল অর্থনীতি গড়ার কারিগর হলো কৃষকরা। তাদেরই এত দুর্দশা। তাদের উন্নতির কথা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি বলে না কেন? রাজ্যের জনসাধারণ কত বেশি দামে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করছে। এই নতুন কৃষি আইনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের বাজার থেকে ফড়েরাজ ও দালাল চক্র শেষ হয়ে যাবে। পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের প্রতারিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কারণ চুক্তিভিত্তিক চাষের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের কৃষকদের নিয়ে ফার্মাস প্রডিওসার অরগানাইজেশন (এফপিও) গঠন করবে। তার কাজ বিভিন্ন ব্লকে ও জেলাতে শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে। পরে ৩০০-৫০০ জন কৃষক একসঙ্গে মিলে একটি ফামার্স প্রডিউসার কোম্পানি তৈরি করতে পারবেন। তবে এই কোম্পানির সদস্য কেবলমাত্র কৃষকরাই হতে পারবেন। পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা এর সুফল পাবেন। কৃষকরা নিজে থেকে কৃষি পণ্য বিপণন, প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং ও মার্কেটিং করতে পারবেন। সেই সঙ্গে কৃষকরা এই কোম্পানির মাধ্যমে কম দামে ভালোমানের বীজ, কীটনাশক, রোগনাশক ও সার ক্রয় করতে পারবেন। বিনামূল্যে কৃষকদের কৃষি প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ফলে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা নিজেরাই স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবেন।

(লেখক কৃষিবিদ এবং রাজ্যের কৃষক সংগঠনের সদস্য)

নদী থেকে দেবী সরস্বতী নানা রূপে

নন্দলাল ভট্টাচার্য

'অম্বিতমে নদীতমে দেবীতমে সরস্বতি' (ঋক ২/৪১/১৬) জননীদের মধ্যে সর্বোত্তমা তুমি, নদীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, দেবীদের মধ্যে তোমার স্থান সকলের আগে, তুমি দেবী সরস্বতী।

ঋগ্বেদে ওই একবারই নয়, বারবারই সরস্বতীর বর্ণনা করা হয়েছে দেবী ও জননী হিসেবে। সেইসব বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, নদী সরস্বতী ভারতীয় জীবনে ক্রমেই দেবী রূপ পরিগ্রহ করে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে সরস্বতীর কথা বলতে গিয়ে এক অপরূপ কাব্যরূপ যেন রচিত হয়েছে। তার মধ্য দিয়েই ফুটে উঠেছে— মানুষটির— সন্তানের আর্তি। দশম মণ্ডলের সপ্তদশ স্তোত্রের একটি অংশে দেবীকে মা হিসেবে কল্পনার একটি ছবি পরিস্ফুট কাব্যময় বর্ণনায়,—

সরস্বতী—মা-মাগো আমার,
অফুরন্ত স্নেহ মমতায়
তোমার বিপুল জলরাশি
যখন ঘৃতের ধারার মতোই
নিরন্তর বহমান।
তুমি আমার সুহাসিনী মা
সদানীরা—পূত জলধারা
নীলকণ্ঠের মতো নিঃশেষ করো পান
সব মালিন্য—গ্লানি—কলুষরাশি।
মা আমার সরস্বতী
তুমি আমায় শোধন করো—
শুচি করো, পূত করো, করো মুক্ত।

বৈদিক যুগের প্রথম পর্বে বর্তমানের গঙ্গার মতোই সরস্বতী ছিল অতি পবিত্র এক নদী। তার জল পরিশুদ্ধ করত সকলকে। নদী সরস্বতী ছিল উত্তর ভারতের দেবী সমা নদী। ক্রমে নদী রূপ নেয় দেবীর। সরস্বতী হয়ে ওঠেন জ্ঞান-বুদ্ধি-সংগীত-বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বেদের পরের দিকেই সরস্বতী পূজিত হতে থাকেন দেবী রূপে। তাঁকে বলা হয় বোধ বা জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী। এই বিবর্তনের কথা আছে ঋগ্বেদের পরবর্তীকালে রচিত বেদ এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে। ক্রমবিবর্তনে পরিবর্তিত হতে থাকে তার অর্থও। সরস্বতী অর্থে 'যে জল শুচি বা পবিত্র করে'। পরিবর্তে নতুন অর্থ হয়, 'যে বাক্ পরিশুদ্ধ করে'। অর্থ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেবী রূপের ভাবনাতেও আসে পরিবর্তন। যুক্ত হয় অলৌকিক মহিমা। সেইসঙ্গে পরিবর্তিত হতে থাকে মূল শব্দ বা বাক্যবন্ধের অর্থও। 'বাক্ পরিশুদ্ধ করে' পরিবর্তিত অর্থে হয় 'জ্ঞান পরিশুদ্ধ করে।' শেষ পর্যন্ত বলা হয়, সরস্বতী হলেন কলা, শিল্প, সংগীত, ছন্দ, ভাষা, অলংকার এবং সমস্ত রকম সৃজনশীল কর্মের দেবী— ওইসব কর্মের মধ্য দিয়েই তিনি শুদ্ধ করেন মানুষের আত্মার সৌন্দর্যকে।

দেবী সরস্বতীর উল্লেখ শুধু বেদ বা ব্রাহ্মণ নয়, রয়েছে উপনিষদ এবং ধর্মশাস্ত্রগুলিতেও। সবগুলিরই একটি কথা,— দেবী সরস্বতী মানুষের চেতনাকে সমৃদ্ধ করে তথা পরিচালিত করেন সৎ এবং সুন্দরের পথে। তাকে প্রোৎসাহিত করেন সবরকম সৃজনশীল কর্মে।

প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রগুলিতে সরস্বতী নানা নামে বিভূষিত। কোথাও তিনি ব্রাহ্মণী (ব্রহ্মের শক্তি), ব্রাহ্মী (বিজ্ঞানের দেবী), ভারদি (ইতিহাসের দেবী), বাণী এবং বাচী (সংগীত, বাগ্মিতার দেবী), বর্ণেশ্বরী (অক্ষরের দেবী), কবি জিহ্বাপ্রবাসিনী। শুধু তাই নয়, সরস্বতী বীণাবাদিনী, পুস্তকধারিণী, বীণাপাণি, হংসবাহিনী এবং বাগ্‌দেবী নামেও পূজিতা। পরিচিতা।

শুধু সংস্কৃত নয়, অন্য ভাষাতেও সরস্বতী নানা নামে পূজিত হন। হিন্দিতে সরস্বতী নামটি প্রচলিত। তেলুগুতে তিনি ছাদুভুল্লা থালি, কোঙ্কনিতে সারদা, বীণাপাণি, পুস্তকধারিণী, বিদ্যাদায়িনী, কন্নড়ে তাঁকে বলা হয় শারদে, শারদাম্বা, বাণী, বিণাপাণি। তামিলনাড়ুতে তাঁর পরিচয় কলাইমঙ্গল, নামঙ্গল, কলাইবাণী, বাণী, ভারতী। আবার কোথাও তিনি বাগীশ্বরী, সাবিত্রী, গায়ত্রী।

কেবল ভারত নয়, তার বাইরেও বিদ্যার দেবী হিবেবে পূজা হয় সরস্বতীর। মায়ানমারে তাঁকে বলা হয় থুরাথাডি বা টিপিটিকা মেডু, চীনে বিয়ানসাইঠিয়ান, জাপানে বেলজাইটেন এবং তাইল্যান্ডে সুরতস্বাদী বা সরৎস্বদী।

দেবী সরস্বতীর এই নামাবলির প্রসঙ্গ থেকে দেবীর উদ্ভবের বা বিকাশের ইতিহাসের পাতায় চোখ বোলালে দেখা যাবে, হিন্দু ঐতিহ্যে বৈদিক যুগ থেকে আজও দেবী সরস্বতী স্বমহিমায় বিরাজিত। মহাভারতের শান্তিপর্বে সরস্বতীকে বলা হয়েছে বেদজননী। ব্রহ্মার বিশ্ব সৃষ্টির সময় উচ্চারিত ধ্বনিই বাগ্‌দেবী। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের মতে বাগ্মিতা এবং সুমধুর সংগীতের জননী দেবী সরস্বতী। তিনিই ব্রহ্মার সক্রিয় চালিকা শক্তি।

কেবল বেদ, ব্রাহ্মণ বা উপনিষদ নয়, তাঁর উল্লেখ রয়েছে বহু সংস্কৃত গ্রন্থে। যেমন অষ্টম শতকে রচিত 'শারদাতিলকে' আছে, সরস্বতী হলেন, বাগ্‌দেবী। তিনি যেন সুভাষণের ক্ষমতা। তাঁর মাথায় রয়েছে নবীন চন্দ্র। অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী দেবী শ্বেতপদ্মাসীনা, তাঁর করকমল থেকে ঝরে পড়ছে লিখন ও গ্রন্থ রচনার অমৃতধারা।

বৌদ্ধশাস্ত্রেও রয়েছে দেবী সরস্বতীর কথা। এখানে তিনি বৌদ্ধদেবী মঞ্জুশ্রীর সহচরী। বৌদ্ধ গ্রন্থ সাধনকলায় দেবীর যে বর্ণনা রয়েছে তা হুবহু দেবী সরস্বতীর মতো। একই কথা জৈন গ্রন্থগুলিতেও।

শ্বেতাম্বরা দেবীর মূর্তি কল্পনায় অনেক সময় তিনি শ্বেতপদ্মাসীনা। এই পদ্ম হলো আলো, জ্ঞান ও সত্যের প্রতীক। পরমসত্য তাঁর জ্ঞাত। তাঁর শ্বেত বসন, শ্বেত পদ্মাসন, বাহন শ্বেত হংস— এই সবই হলো সত্ত্বগুণের প্রতীক। সরস্বতীর ধ্যানমন্ত্রে তাঁকে জ্যোৎস্নার মতো শ্বেত শুভ্র, শ্বেতবসনা, শ্বেতাভরণা, পুস্তক ও লেখনী হস্তা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সাধারণত সরস্বতী চতুর্ভুজা, তবে অনেক সময় দেখা যায় তাঁর দ্বিভুজা রূপও। যখন তিনি চতুর্ভুজা তখন তাঁর সেই চারটি হাত হলো তাঁর পতিদেব ব্রহ্মার চারটি মস্তকের প্রতীক। এই চার মস্তক বা দেবীর চার হাত হলো— মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকারের প্রতীক। ব্রহ্মা হলেন বিমূর্ত আর দেবী সরস্বতী হলেন ক্রিয়াশীল বাস্তব।

দেবীর চার হাতে রয়েছে পুস্তক, মালা, জলপূর্ণ পাত্র এবং বাদ্যযন্ত্র বীণা। তাঁর হাতের ওই পুস্তক হলো বিশ্বজ্ঞান বেদ, স্ফটিকের মালা হলো ধ্যানশক্তি--- আধ্যাত্মিকতা, জলপূর্ণ পাত্র হলো সবকিছু শুদ্ধ করার বা সোমের ভাণ্ড এবং বীণা সৃজন শক্তির প্রতীক।

সরস্বতী হলেন হংসবাহনা। হংস যেন স্বর্গের পাখি। দুধ-জলের মিশ্রণে দুধ ও জলকে পৃথক করার ক্ষমতার অধিকারী এই হংস। হংস হলো পরম আধ্যাত্মিক শক্তি এবং মোক্ষের প্রতীক।

দেবী সরস্বতী হংসবাহনা। তবে কখনও কখনও তাঁর বাহন হিসেবে চিত্রমেখলা বা ময়ূর দেখা যায়। ময়ূর হলো বিচিত্র বর্ণ ও ঔজ্জ্বল্যের প্রতীক। ময়ূর নৃত্যেরও প্রতীক। আবার সাপের শত্রু, সর্ববিষহর হলো ময়ূর।

আধ্যাত্মিক দিক থেকে সরস্বতী হলেন ত্রিদেবীর অন্যতম। ভারতীয় ধর্মসাধনা ও দর্শনে ত্রিদেব হলেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর— সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধিকর্তা। আর ত্রিদেবী হলেন সরস্বতী, লক্ষ্মী ও পার্বতী। এঁরা হলেন মূল প্রকৃতি বা আদি প্রকৃতি। শক্তিতত্ত্বে সরস্বতীকে বলা হয় মহা সরস্বতী— ব্রহ্মা ঘরনি তিনি সৃষ্টির দেবী, মহালক্ষ্মী হলেন বিষ্ণুঘরনি স্থিতির দেবী, আর শিবঘরনি মহাকালী হলেন প্রলয়ের দেবী।

নদী থেকে দেবী হলেন সরস্বতী। অথবা দেবীই এই মর্ত্যে আবির্ভূত হন নদীরূপে। পদ্মপুরাণের সৃষ্টি খণ্ড ও স্কন্দ পুরাণে রয়েছে এই কাহিনি।

একবার ব্রাহ্মণ ভার্গব এবং ক্ষত্রিয় হেহাদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। তার থেকে জ্বলে ওঠে বাড়বাগ্নি। এ আগুনে ধ্বংস হতে পারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। অবস্থা দেখে ভীত হন দেবতারাও। ছুটে যান তাঁরা বিষ্ণু ও শিবের কাছে। তাঁরা জানান, সরস্বতীই এই আগুন নেভাতে সক্ষম। তাই তাঁর কাছে যান নদী হয়ে মর্ত্যে নেমে সেই আগুন নেভানোর জন্য। আর্তি নিয়ে। সব দেবতা ও দেবী তাঁকে অনুরোধ করেন তাঁকে ওই আগুন নেভানোর কাজে সাহায্য করতে।

সরস্বতী বলেন, ব্রহ্মা যদি রাজি হন তাহলেই তিনি নদীরূপে বইবেন ভূভাগে। সকলে এবার ব্রহ্মাকে অনুরোধ জানান। ব্রহ্মা সম্মত হলে সরস্বতী ব্রহ্মলোক ছেড়ে আসেন ঋষি উতঙ্কের আশ্রমে। সেখানে শিবের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। শিব একটি পাত্রে বাড়বাগ্নিকে রেখে সেটি দেন সরস্বতীকে। বলেন একটি অশ্বত্থ বা পাকুড় গাছ থেকে তাঁকে উৎপন্ন হতে। সেই নির্দেশমতো ওই গাছে মিশে যান সরস্বতী। সেখান থেকে সাগর পথে শুরু হয় তাঁর যাত্রা। অবশেষে সাগরে মিলিত হয়ে সেই কালাগ্নিকে বিসর্জন দেন সেখানে। গঙ্গাবতরণের মতো এই ভাবেই সরস্বতীরও মর্ত্যে আগমন হয়।

ভারতীয় পুরাণ কথায় আছে সরস্বতীর নানা অবতার ও রূপের কথা। কাশ্মীরে শাক্ত সারদা পীঠে তিনি মহাসরস্বতী। ব্রহ্মাণ ঘরনি রূপে তিনি হন ব্রহ্মাণী। তখন তিনি স্বয়ং ব্রহ্মবিদ্যা। মহাবিদ্যা তিনি মাতঙ্গী ও তারা রূপে। গায়ত্রী রূপে তিনি বেদের শুদ্ধতা রক্ষাকারী এবং সাবিত্রী রূপে ব্রহ্মার ঘরনি— বিশুদ্ধতার প্রতীক। এইভাবে কোথাও তিনি মহাসরস্বতী, কোথাও নীল সরস্বতী। দেবী সরস্বতীর প্রাচীনতম মন্দির রয়েছে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে সারদাপীঠে। মাঘ মাসের শুক্লাপঞ্চমী বা বসন্ত পঞ্চমীতে তাঁর পূজা হয়।

এছাড়া নবরাত্রির সপ্তম দিবসেও হয় সরস্বতীর পূজার্চনা।

(সরস্বতী পুজো উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

সূর্যই সকল প্রাণীর আত্মা স্বরূপ

অমিত ঘোষ দস্তিদার

বৈদিক ঋষিদের দেব-দেবী স্তুতি এবং জগৎসংসারের সজীব- নির্জীব, চেতন-অচেতন, দৃশ্য-অদৃশ্য ইত্যাদি সমস্ত কিছুর সমস্ত সীমা বিশ্বদেবতার স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৫৫ সূক্তে তাই বারবার বলা হয়েছে— 'মহাদ্দেবানামসুরত্বমেকম্'— অর্থাৎ সমস্ত দেবতাগণের মহৎবল— এক।

ঋগ্বেদে বহু দেবতা স্তুত হলেও বৈদিক ঋষিগণ বিশ্বাস করতেন যে, বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন রূপে ব্যক্ত দেবতারা বস্তুত সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরম সত্তারই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশমাত্র। এই চরম সত্যটি প্রকাশিত হয়েছে ঋগ্বেদের একটি বহুবিশ্রুত মন্ত্রে— 'একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ। (ঋ.সং-১/১০৪/৪৬)।।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সূক্তগুলিতে একদিকে যেমন সৃষ্টি বিষয়ে প্রাচীন ঋষিগণের ধ্যানধারণা প্রকাশিত হয়েছে, অপরদিকে অভিব্যক্ত হয়েছে। সংহিতোত্তর যুগে একেশ্বরবোধের যে ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার বীজ নিহিত আছে ঋগ্বেদের দার্শনিক সূক্ত সমূহে।

ঋষি কাত্যায়ন তাঁর 'সর্বানুকক্রমণী গ্রন্থে (২.১৩-২০) স্পষ্টই বলেছেন, 'কর্মপৃথক্ত্বাদি হি পৃথগভিধানস্তত্রয়ো ভবন্তি। একো হি মহান্ আত্মা দেবতা। স সূর্য ইত্যাচক্ষতে। স হি সর্বভূতাত্মা। তদুক্তমৃষিণা,— 'সূর্য আত্মা জগৎস্তস্থুষশ্চ' ইতি। তদ্বিভূতয়োহন্যা দেবতাঃ। তদপ্যেতদুক্তম্— ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নি-মাহুরিতি।।' অর্থাৎ কর্মের পৃথকত্ব হেতু পৃথক্ পৃথক্ নামে দেবতার স্তুতি হয়ে থাকে। একই মহান আত্মা দেবতা, তিনি সূর্যরূপে আখ্যাত। তিনিই সকল প্রাণীর আত্মাস্বরূপ। তাই ঋষি কত্যায়ন বলেছেন— সূর্য সব স্থাবর জঙ্গম পদার্থের আত্মাস্বরূপ। অন্যান্য দেবগণও তাঁরই বিভূতি স্বরূপ। ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি, একই, সত্তার নাম।

নিরুক্তকার আচার্য যাস্ক 'সূর্য' শব্দের ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা করে লিখেছেন— সূর্যঃ সর্ত্তের্বা, সুবর্তেবা, স্বীর্য্যতের্বা (ঐ. ১২/১৪)। ভাষ্যকার দুর্গাচার্য্য এর ব্যাখ্যা করে লিখেছেন— সর্ত্তের্বা সূর্যঃ, সুবর্তেবা, প্রসবার্থস্য স এব হি ইদং সর্বং প্রসূবতি জনয়তীত্যর্থঃ। অর্থাৎ যিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে বিশ্বভুবনকে প্রসব করেন বা নবরূপে প্রকাশ করেন তিনিই সূর্য।

মহামহিমময় সূর্য এক এবং অদ্বিতীয়। কালভেদে সূর্য কখনো সবিতা, কখনো পূষা, কখনো মিত্র, কখনো বা বিষ্ণু। এই দেবতারা সৌরদেবতা। প্রখ্যাত ভাষ্যকার সায়ণাচার্য ঋগ্বেদের ৫/১৮/৪ মন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে সূর্য ও সবিতার মধ্যে ভেদ প্রসঙ্গে বলেছেন— 'উদয়াৎ পূর্বভাবী সবিতা। উদয়াস্তময়মধ্যবর্ত্তী সূর্যঃ', অর্থাৎ 'সবিতা সূর্যোদয়ের পূর্বভাষী রূপ। উদয়কাল থেকে অস্তকাল পর্যন্ত আবার তিনিই সূর্য।' আচার্য্য যাস্কও তাঁর নিরুক্তে সবিতৃদেবের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে একই কথা বলেছেন— 'তস্য কালো যদা দ্যৌরপহততমস্কাকীর্ণ— রশ্মির্ভবতি' (ঐ. ১২/১২)— অর্থাৎ 'যখন দ্যুলোক থেকে অন্ধকার অপগত হয় এবং উদীয়মান সূর্যমণ্ডলের আভায় আকাশ পরিব্যাপ্ত হয়, তখনই সবিতৃদেবতার কাল।' সবিতাই সূর্যকে আনয়ন করেন (১/৩৫/৯)। ঋগ্বেদে (১০/৩৭/১) সূর্যকে 'দিবস্পুত্র' বলা হয়েছে, সূর্য অদিতির পুত্র এমন উক্তিও ঋগ্বেদে আছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে যে পুরুষ সূক্ত (১০/৯০) আছে সেখানে 'সহস্রশীর্ষা সহস্রপাৎ' সেই বিরাট পুরুষের চক্ষু থেকে সূর্যের উৎপন্ন হয়েছে বলেও বর্ণনা করা হয়েছে।

ঋগ্বেদে (৭/৭৫/৫, ৭/৭৮/৩, ১/১২৩/১, ১/১২৩/১১) ঊষাকে প্রণয়ী, ভার্যা, ভগিনী, জনয়িত্রী ইত্যাদিভাবে সূর্যের সঙ্গে আত্মীকভাবে কল্পনা করা হয়েছে।

ঋগ্বেদে (ঋ. সং ১/৫০/৮) বলা হচ্ছে সূর্যের রথের বাহন সাতটি অশ্ব— সপ্ত ত্বা হরিতো রথে বহন্তি দেব সূর্য। —সূর্য আকাশে উদিত হলে তাঁর কিরণ সমূহ অশ্বের গতিতে সর্বত্র বিস্তৃত হয়। তাই সাতটি কিরণকে সূর্যের অশ্ব বলা হয়। ভূপৃষ্ঠ থেকে জলীয় অংশ টেনে নেয় বলে তাদের 'হরিৎ' অর্থাৎ রসহরণশীল নামে উল্লেখ করা হয়।

প্রাচীনকাল থেকে সূর্য আমাদের অতি পরিচিত। ঋগ্বেদ সংহিতা (১০/৩৭/৭) থেকে জানা যাচ্ছে প্রতিদিন দৃষ্ট সূর্যের মহিমাকে চিরদিন প্রত্যক্ষ করবার জন্য বৈদিক ঋষিগণ মনের আকুতি-সহ প্রার্থনা জানিয়েছেন— 'এই সূর্যদেবতাকে দর্শন করবার জন্য আমাদের চক্ষু যেন শক্তিশালী হয়, সূর্যদেবতার মহিমা এবং কান্তি দর্শনের জন্য আমরা একশত শরৎকাল যেন উপভোগ করি'। প্রকৃতপক্ষে প্রাণের আহ্বান করি। ▯

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

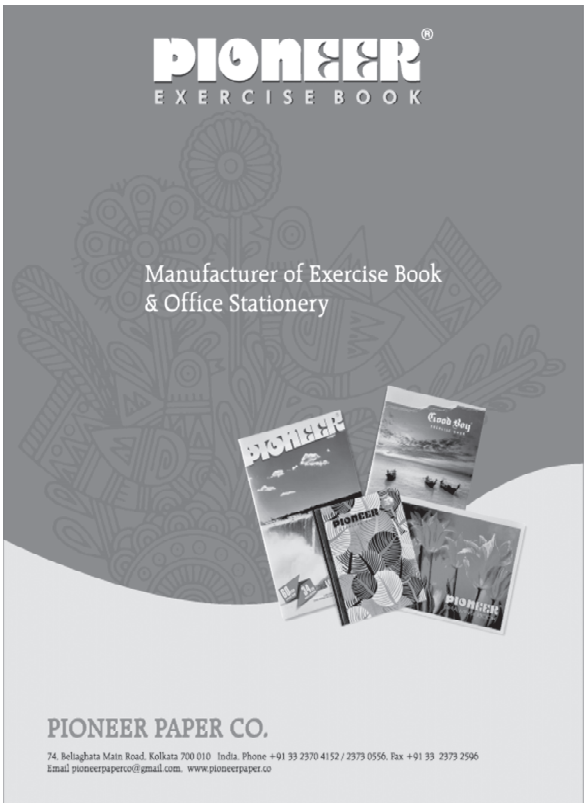

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

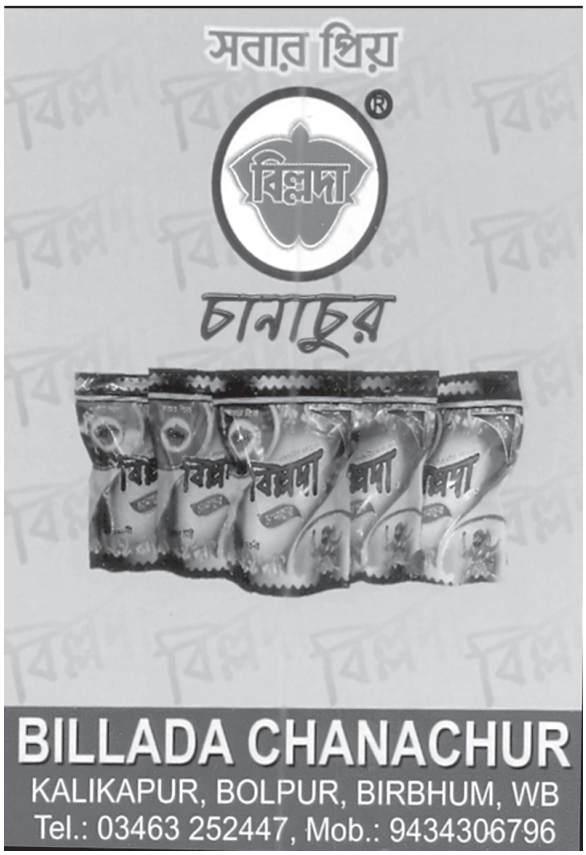

সারা বিশ্বে দেশকে অপমান করার দায় নিতে হবে কৃষক নেতাদের

ধীরেন দেবনাথ

কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে এদেশের এক শ্রেণীর আন্দোলনকারী কৃষক গণতন্ত্র দিবসের মর্যাদা ও গরিমাকে যে ভাবে কলঙ্কিত করেছে ভারতের ইতিহাসে তা এক কলঙ্কময় অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ভাবতে অবাক লাগে, গণতান্ত্রিক ভারতে গণতন্ত্রই আজ ভূলুণ্ঠিত! অতঃপর আমরা কোন মুখে বলব, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক দেশ ভারত? এ ঘটনা ভারতবাসীর কাছে এক লজ্জা! এক নজিরবিহীন গুন্ডামি, দাঙ্গা ও অস্ত্রের আস্ফালনের সাক্ষী হয়ে থাকল সারা ভারত, সারা বিশ্ব। অন্যান্যবারের মতো এবারও ২৬ জানুয়ারি গণতন্ত্র দিবসে দিল্লির বিজয়চকে চলছিল কুচকাওয়াজ। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-সহ বহু বিশিষ্টজন। আর তখনই সংযুক্ত কিষান মোর্চার নেতৃত্বে শুরু হয় সশস্ত্র তাণ্ডবলীলা। দু' মাসাধিককাল ধরে কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে যেসব কৃষক দিল্লি সীমান্তে ধরনায় বসেছিল, তারা হাজার হাজার ট্রাক্টর চালিয়ে ঢুকে পড়ে অনুষ্ঠানস্থলে। চালায় নৃশংস তাণ্ডব। আন্দোলনকারীরা পুলিশের দেওয়া নির্ধারিত রুট বদলে ট্রাক্টর নিয়ে লালকেল্লার দিকে যায় এগিয়ে। পুলিশ বাধা দিলে বেধে যায় খণ্ডযুদ্ধ। ট্রাক্টর উলটে মারা যায় এক আন্দোলনকারী। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠলে আন্দোলনকারীরা পুলিশকে লাঠিপেটা করে। বহু পুলিশ আহত হয়। মাথা ফেটে রক্তাক্ত হয়। চলে ব্যাপক ভাঙচুর। আর এরই মধ্যে একদল আন্দোলনকারী লালকেল্লার উপরে উঠে স্লোগান দেয়। লোহার পাইপ বেয়ে উঠে জাতীয় পতাকার পাশে টাঙিয়ে দেওয়া হয় তাদের ঝান্ডা।

সর্বোচ্চ আদালত আন্দোলনকারী কৃষকদের গণতন্ত্র দিবসে দিল্লির রাজপথে ট্রাক্টর র‍্যালিতে হস্তক্ষেপ করতে রাজি না হওয়ায় সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে দিল্লি পুলিশের বৈঠক হয়। র‍্যালিতে অনড় থাকায় পুলিশ একটা নির্দিষ্ট রুটে র‍্যালির অনুমতি দিলে নেতৃবৃন্দ তাতেই রাজি হন। কিন্তু তাঁরা কথা রাখেননি। আর তাতেই বিপত্তি ঘটে। তাই প্রশ্ন, দিল্লির অগ্নিগর্ভ ও ধ্বংসাত্মক তাণ্ডবলীলার দায় কি ওই কৃষক নেতারা এড়াতে পারেন? পারেন কি অস্বীকার করতে তাঁদের দায়-দায়িত্ব? যদিও এখন তাঁরা উলটো সুরে গাইছেন। বলছেন, সমাজ বিরোধীরা র‍্যালিতে ঢুকে শান্তিপূর্ণ র‍্যালিকে অশান্ত করেছে। কিন্তু একথায় কি চিড়ে ভিজবে?

কৃষক আন্দোলনের নামে গণতন্ত্র দিবসের দিন দিল্লিতে লালকেল্লায় দুষ্কৃতী হামলা, তোলা হলো ধর্মীয় পতাকা।

পুলিশ কিন্তু যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। তা না হলে হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত। ঘটত প্রচুর ক্ষয়ক্ষতিও। আর তাতে মুখ পুড়ত মোদী সরকারের তথা ভারতের। বিরোধীরাও হাতে পেয়ে যেত মোদী সরকারের মুণ্ডুপাতের মোক্ষম অস্ত্র। বিদেশে ধাক্কা খেত মোদী সরকারের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি। বিরোধীরা বিশেষত কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, আকালি, সমাজবাদী, শিবসেনা— যারা নয়া কৃষি আইনের বিরোধী, ধরেই নিয়েছিল, গণতন্ত্র দিবসে কৃষি আইন বিরোধী আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দিল্লি পুলিশের সংঘর্ষে দিল্লির রাজপথ রক্তাক্ত হবেই এবং রাজনৈতিক স্বার্থে তারা চেয়েওছিল সেটা। তারা আরও চেয়েছিল, দিল্লির রাজপথে আন্দোলনকারী কৃষকদের লাশ পড়লে, রক্ত ঝরলে দেশ ও বিদেশে উঠবে মোদী সরকার বিরোধী সমালোচনার ঝড়। আর তাতে সরকারের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত হবে। যার ফসল ঘরে তুলবে বিরোধীরা। কিন্তু তাদের সব আশায় জল ঢেলে দিয়েছে দিল্লির পুলিশ প্রশাসন। বিরোধী দলগুলি বিশেষত কংগ্রেস ভাবতেই পারছে না, বিক্ষোভকারীরা দিল্লির একটা অংশ অবরুদ্ধ করে, দখলে নিয়ে, কয়েক ঘণ্টা ধরে তাণ্ডব চালাল,শ'খানেক পুলিশ জখম হলো, অথচ পুলিশ নির্বিকার! পুলিশের গুলিতে একজন বিক্ষোভকারীরও মৃত্যু হলো না! বিরোধীরা তাই হতাশ। কারণ যারা লাশের রাজনীতি করে তাদের হতাশ হওয়ারই কথা। এখানেই মোদী সরকারের কাছে বিরোধীদের নৈতিক ও রাজনৈতিক পরাজয়। অতঃপর বিরোধীদের যে 'বাড়াভাতে ছাই পড়ল' তা বলাই বাহুল্য।

ইতিমধ্যেই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী দুটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষক সংগঠন সহিংস আন্দোলনের নিন্দা করে সরে দাঁড়িয়েছে। ফলে আন্দোলনে পড়েছে ভাঁটার টান। বাজেট অধিবেশনের শুরুর দিন সংসদভবন অভিযান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত তারই প্রমাণ। সত্যি বলতে, ২৬ জানুয়ারি দিল্লির রাজপথে বিশেষ করে ইতিহাস প্রসিদ্ধ লালকেল্লায় বিক্ষোভকারীদের সশস্ত্র তাণ্ডব, ভাঙচুর, জাতীয় পতাকার অবমাননা, পুলিশকে জখম করা ও দাঙ্গার পরিস্থিতি সৃষ্টি করাকে দেশবাসী ভালো মনে মেনে নেয়নি। বরং জনমনে সৃষ্টি করেছে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। যার কুফল ভোগ করতে হবে আন্দোলনকারী কৃষক সংগঠন ও তাদের সমর্থক রাজনৈতিক দলগুলিকে, বিশেষত কংগ্রেসকে। একেই বলে, 'অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।' মোদী সরকারকে ঘায়েল করার অস্ত্র বুমেরাং হয়ে ফিরে এসেছে বিরোধীদের দিকে। আন্দোলনের অন্যতম কাণ্ডারি কৃষকনেতা রাকেশ টিকায়েত, যোগেন্দ্র যাদব, হান্নান মোল্লা, মেধা পাটেকররা অতঃপর ওই সহিংসতার কী জবাব দেবেন? কী জবাবই বা দেবে বিরোধী দলগুলি? কিন্তু জবাব তা দিতেই হবে সবাইকে জনতার কাছে। নিতে হবে গণতন্ত্র দিবসকে কলঙ্কিত করার দায়ও। কারণ ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না।

গোয়েন্দা সূত্রের খবর, দিল্লিকাণ্ডে খালিস্তানিদের হাত আছে। কারণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী খালিস্তানপন্থী শিখরা ভারতের সংসদে পাশ হওয়া কৃষিআইনকে 'শিখবিরোধী' বলে বিক্ষোভে শামিল হয়েছে। কয়েকটি দেশের সর্বোচ্চ শাসকরা শিখ ভোট হাতাতে নয়া কৃষিবিলের বিরোধিতা করে বিবৃতি দিয়েছেন এবং কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন। এদের মধ্যে কানাডা জাস্টিন ট্রুডো অন্যতম। ভারত এর তীব্র প্রতিবাদ করেছে। তবে একথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে, শিখ সম্প্রদায়ের সবাই ভারত বিরোধী নয় এবং সবাই যে ওই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বা কৃষি আইনের বিরোধী তাও নয়। বরং গরিব ও নিম্নবিত্ত চাষিরা কৃষি আইনের পক্ষে। মূলত সম্পন্ন কৃষক, যাদের কোটি কোটি টাকার কৃষি পণ্যের ব্যবসা আছে, আছে নিজস্ব গুদাম, হিমাগার, সবজিমান্ডি, প্রচুর সংখ্যক ট্রাক্টর, লরি ও বিঘা বিঘা জমি— তারাই কৃষি আইনের বিরুদ্ধে।

কারণ এরাই গরিব কৃষক বা চাষিদের কাছ থেকে সরাসরি খুব কম দামে কৃষিপণ্য বা ফসল কিনে নেয়। কখনও আবার এরা কোনো কোনো ক্ষুদ্র চাষিকে দাদন দেয় এই শর্তে যে উৎপাদিত ফসল তাদের কাছেই বিক্রি করতে হবে। এই সম্পন্ন কৃষকরাই ফসলের সংরক্ষণ, মূল্য নির্বারণ ও বাজার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এদের কোটি কোটি টাকার ব্যবসা। বিদেশেও এদের ব্যবসা আছে। প্রাসাদোপম বাড়ি। নিজস্ব গাড়িতে চড়ে। পঞ্জাব ও হরিয়ানায় শিখ কৃষকদেরই দাপট বেশি। কিন্তু অন্যত্র নেই। তাই প্রশ্ন, পঞ্জাব ও হরিয়ানায় কৃষি আইনের বিরুদ্ধে এত বিক্ষোভ-আন্দোলন থাকলেও অন্যান্য রাজ্যে নেই কেন? কারণ সহজেই অনুমেয়। এই দুটি রাজ্যের চাষিরা ইচ্ছেমতো একটা লাভজনক দামে উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতে পারে। দাদন নেওয়া চাষির সংখ্যা কম। অধিকাংশ চাষির নিজস্ব জমি আছে। উদ্বৃত্ত ও অবিক্রিত ফসল হিমঘরে রাখার সামর্থ্যও রয়েছে। উপরন্তু ওই দুটি রাজ্যে রয়েছে খালিস্তানপন্থী শিখ উগ্রবাদীদের খবরদারি ও ভারত-বিরোধিতায় মদত। এই খালিস্তানিরা রয়েছে আমেরিকা, কানাডা, ব্রিটেন-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। এরা স্বাধীন খালিস্তানের প্রবক্তা ও দাবিদার। পাকিস্তানও নেমেছে ঘোলাজলে মাছ ধরতে। দিল্লিকাণ্ডে মদত আছে পাকসেনা ও ইসলামিক জঙ্গি সংগঠনগুলির। এদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতের অভ্যন্তরে জনরোষ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে মোদী সরকারের ভাবমূর্তি ও দেশের স্থায়িত্ব ক্ষুণ্ণ করা। আর এই সহিংস আন্দোলনের সঙ্গে যোগ রয়েছে ভারত-বিরোধী 'টুকরে গ্যাং'দেরও। এক সময় 'নাগরিকত্ব সংশোধন আইন' (সিএএ)-কে মুসলমান বিরোধী বলে প্রচার করেছিল মুসলমান তোষণকারী রাজনৈতিক দল, ইসলামিক দল ও একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী। এরাই আবার 'নয়া কৃষি আইন'কে বলছে শিখ বিরোধী। খালিস্তানপন্থীদের মুখেও সেই একই কথা। তাছাড়া স্বার্থান্বেষী মহল কৃষকদের খেপিয়ে তুলতে অপপ্রচার চালাচ্ছে এই বলে যে— সরকার সর্বনিম্ন সহায়ক মূল্য তুলে দিচ্ছে। কিন্তু এর কোনো সত্যতা নেই। সরকার এখনও কৃষকদের কুইন্টাল প্রতি ১৮০০ টাকা সহায়ক মূল্য দিচ্ছে। তবে এ টাকাও পায় ধনী কোটিপতি কৃষকরা ও মান্ডিওয়ালারা। গরিব কৃষকরা এই প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত।

মনে রাখতে হবে, ভারত মূলত কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের জনসংখ্যার একটা বড়ো অংশ কৃষক। অথচ পঞ্জাব ও হরিয়ানার কৃষকদের একটা ক্ষুদ্রাংশ ধনী কৃষকরাই দিল্লিকাণ্ড ঘটিয়েছে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের কৃষকরা যখন কৃষি আইন নিয়ে নীরব তখন ওই দুই রাজ্যের ধনী, কোটিপতি কৃষকরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এর একমাত্র কারণ, নিজেদের স্বার্থে আঘাত পড়া। এঁরা নিজেরা জমি চাষ করে না। হাল ধরে না, ট্রাক্টর চালায় না। তবু এরা কৃষক। চাষবাসের মৌরুসিপাট্টা এঁদের হাতে। আসলে এরা স্বার্থপর। দেশবিরোধী শক্তিদ্বারা পরিচালিত।

গণতন্ত্র দিবসের মর্যাদা ও গরিমাকে কালিমালিপ্ত করে দেশ ও বিদেশের মদতে যেসব দেশদ্রোহী খালিস্তানের পক্ষে এবং ভারতের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে কয়েকঘণ্টা ধরে দিল্লির বুকে অবাধে দাঙ্গা করেছে পুলিশ তাদের খুঁজে বের করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিক। যে যতই প্রভাবশালী হোক, কাউকে যেন রেয়াত করা না হয়। দেশপ্রেমিক দেশবাসী চায়, দাঙ্গাবাজ ও মদতদাতাদের উপযুক্ত শাস্তি। কারণ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব।

ভারতের বহু ইকবাল হৃদয়ে ব্যথা নিয়ে বাস করছেন

গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়

মহম্মদ ইকবাল ভারতে সুপরিচিত তাঁর তরানা-ই-হিন্দ বা ভারতের সংগীত 'সারে জঁহা সে অচ্ছা হিন্দোস্তাঁ হমারা' গানটির জন্য। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী বিভিন্ন রচনার জন্য তিনি আল্লামা বা মহাপণ্ডিত উপাধি লাভ করেছিলেন। ইকবালের জন্ম হয়েছিল ইসলাম কবুল করা এক কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ পরিবারে। তাঁর প্রপিতামহ ইসলামে ধর্মান্তরিত হন। অধ্যাপক মহম্মদ শহীদুল্লাহের অনুবাদ করা ইকবালের লেখা এক কবিতায় পাই ইকবাল নিজেদের সম্বন্ধে বলেছে—

'আমি আসলে খাস সোমনাতি
আমার বাবা দাদা লাতি ও মানাতি।'

এই লাইন দুটির অর্থ দাঁড়ায় তিনি নিজেকে খাস ভাবে সোমনাত-ই বা সোমনাথের বলছেন। প্রসঙ্গত বলা যায় উর্দুর লিপি নাস্তালিক-এ 'থ' বর্ণটি নেই। তাই সোমনাথ হয়ে গেছে সোমনাত। অনুরূপ ভাবে তাঁর বাবা ছিলেন লাত ই। লাত হলো এক মূর্তির নাম যা হজরত শুয়েবের অনুগামীরা পূজা করতেন। তাঁর দাদা অর্থাৎ পিতামহকে তিনি বলছেন 'মানাতি' বা মানীর অনুগামী। মানী ছিলেন ৮৩১ খ্রিস্টাব্দে ব্যাবিলনে জাত এক চিত্রকর। তিনি মদিনাতে শিক্ষালাভ করেন এ এক নতুন মতের প্রবর্তন করেন।

ইকবালের পূর্বপুরুষেরা ইসলাম গ্রহণ করে কাশ্মীর ত্যাগ করেন ও শিয়ালকোটের কাশ্মীরিয়ান মহল্লায় বসবাস করেন। সেখানেই ১৮৭৭ সালে ইকবালের জন্ম হয়। পরে বড়ো হয়ে তিনি লাহোরে চলে যান ও ১৯৩৮ সালে মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই থাকেন।

'সারে জঁহা সে অচ্ছা' গানটি তিনি লিখেছিলেন ১৯০৪ সালে, অর্থাৎ তাঁর ২৭ বছর বয়সে। গানটি মুদ্রিত হয়েছিল ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে বাঙ-ই-দারা নামক কাব্যগ্রন্থে। উর্দুতে লেখা গানটি ও তার বাংলা আক্ষরিক অনুবাদ নীচে দেওয়া হলো।

তরানা ই হিন্দ

সারে জঁহা সে অচ্ছা হিন্দোস্তাঁ হমারা
হম বুলবুলেঁ হ্যাঁয় ইসকী, ইয়ে গুলস্তাঁ হমারা।
গুরবত মেঁ হো আগর হম রহতা হ্যায় দিল বতন মেঁ,
সমঝো বঁহী হমে ভী, দিল হো জঁহা হমারা।
পর্বত বো সবসে উঁচা হমসায়া আসমাঁ কা
—বো সন্তরী হমারা, বো পাসরাঁ হমারা।
গোদী মেঁ খেলতী হ্যায় ইসকী হজারো নদীয়াঁ,
গুলশন হ্যাঁয় জিনকে দম সে রশ্‌কে জিনাঁ হমারা।
অ্যায় আব-এ-রুদার-গঙ্গা বো দিন হ্যাঁয় য়াদ তুঝকো,
উৎসা তেরে কিনারে জব কারবাঁ হমারা?
মজহব নহীঁ সিখাতা আপস মেঁ কৈর রখনা
হিন্দি হ্যাঁয় হম, বতন হ্যাঁয় হিন্দোস্তাঁ হমারা।
য়ুনান মিশ্র ব রোমা সব মিট গয়ে জঁহা সে
অবতক মগর হ্যায় বাকী নাম ব নিশাঁ হমারা।
কুছ বাত হ্যায় কি হস্তী মিটতী নহীঁ হমারী
সদীয়োঁ রহা হ্যায় দুশ্মন দৌর এ জমাঁ হমারা।
ইকবাল! কোই মহরম অপনা নহীঁ জঁহা মেঁ—
মালুম ক্যা কিসী কো দর্দ-এ-নিহাঁ হমারা।।

শব্দার্থ :

গুলিস্তা/গুলিস্তান = বাটিকা, উদ্যান, বিশ্রামাগার, গুরবত = বিদেশ, পরদেশ। হমসায়া = প্রতিবেশী। হম-বতন (হম = সম) = একই দেশের, সম দেশীয়। পাসরাঁ = দ্বারপাল। রশ্‌কে জিনাঁ = স্বর্গের মতো, স্বর্গকে লজ্জা দেওয়ার মতো। দম = তীক্ষ্ণতা, ব্যক্তিত্ব। আব = জল, রুদার = পূজ্য, সম্মানিত। কারবাঁ = যাত্রীদল। হস্তী = অস্তিত্ব। দৌর = প্রধানতা, পরিবর্তন। জমাঁ = সময়, কাল। দর্দ = কষ্ট, যাতনা। নিহাঁ = গুপ্ত, গোপন। দর্দ ই নিহাঁ = গুপ্ত ব্যথা। মহরম = পরিচিত, বন্ধু, মর্মজ্ঞ।

বাংলায় অনুবাদ

'এই পৃথিবীর সেরা যে দেশ সে দেশ আমার হিন্দোস্তাঁ

তার বাগানের বুলবুল আমি সেই তো আমার গুলিস্তাঁ।
পরবাসে থাকি যখন মন পড়ে রয় এই দেশে
থাকা হয় জেনে সেই দেশেতেই, হৃদয় থাকে যেই দেশে।
সবচেয়ে উঁচু যে পাহাড়, আকাশের যে প্রতিবেশী
সে আমাদের পাহারা দেয়, রক্ষা করে দিবানিশি
আমাদের এই দেশের কোলে হাজার নদী খেলে, ধায়
আমার দেশের গুলবাগিচা স্বর্গও দেখে লজ্জা পায়।
অয়ি গঙ্গে, পুণ্যতোয়ে, সেদিন কি তোমার আছে মনে
যাত্রীদল এক নেমেছিল তোমার তীরে যেই দিনে?
ধর্ম হেথায় শেখায় না তো পরস্পরে বৈরিতা
হিন্দি মোরা সম-স্বদেশ দেশ আমার এ হিন্দোস্তাঁ
ধরা থেকে আজ মুছে গেছে দেখো, রোম ও মিশর, গ্রিসের কৃষ্টি
নাম ও নিশানা নিয়ে আজও মোরা জগজ্জনের টানছি দৃষ্টি।
বিশেষ অনেক আছে মোদের তাই মোছেনি অস্তিত্ব
বহু শতাব্দীর শত্রু-শাসনও করতে মোদের পারেনি রিক্ত
ইকবাল! কোনও মরমি বন্ধু জেনো এ জগতে নেই তোমার।
জানে না কেউ গোপন সে ব্যথা রয়েছে যা বুকে আমার।'

আঠারো লাইনের এই সমগ্র গানটির মধ্যে প্রথম আট লাইনে তিনি মাতৃভূমির বহিরঙ্গের বর্ণনা ও বিদেশে বাস করার সময়ে দেশের জন্য মন কেমন করার কথা লিখেছেন। তার পরবর্তী সবকটি লাইনেই তাঁর মনোবেদনা ও অভিমান প্রকাশ পেয়েছে। গঙ্গাকে সম্বোধন করে তিনি বলেছেন অয়ি পাপনাশিনী (আর এ রুদার) গঙ্গা, সেই দিনটি কি তোমার মনে আছে যেদিন আমাদের দলটি (কারবাঁ) তোমার তীরে (কিনারে) নেমেছিল? (গঙ্গাস্নান করে তাঁদের দলটি শুদ্ধ হয়েছিল বলতে চেয়েছেন কি?)

তার পরের দুই লাইনে ধর্ম (মজহব) এখানে বৈরিতা শেখায় না বলেন। বলেন আমাদের সবার একই দেশ, আমরা সবাই সম-স্বদেশ (হম বতন)। হিন্দোস্তাঁ আমার।

শেষ ছয়টি লাইনে আমরা এক বহুদর্শী দার্শনিক ইকবালকে পাই। তিনি লিখেছেন গ্রিস, মিশর ও রোমের প্রাচীন সভ্যতা জগৎ থেকে মুছে গেছে। ভারতের নাম ও চিহ্ন কিন্তু অটুট আছে।

তারপর তিনি লিখছেন কিছু বৈশিষ্ট্য তো আমাদের অবশ্যই আছে যার জোরে আমাদের অস্তিত্ব (হস্তী) মুছে যায়নি। এখানে তিনি দেশের অন্তরের ঐশ্বর্যের দিকে সংকেত করেছেন। শত শত বছরের (সদীয়োঁ) শত্রু শাসনও (দুশ্‌মন দৌর) যা মুছে ফেলতে পারেনি। ভারতের সেই কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসাবেই তিনি নিজেকে ভাবতেন কিন্তু আচরণে প্রকাশ করতে পারতেন না।

কবিতার শেষ দুই ছত্রে তিনি নিজেকে সম্বোধন করে লিখছেন ইকবাল! তোমার কোনও মর্মজ্ঞ বন্ধু (মহরম) এই পৃথিবীতে (জঁহা মে) নেই, তাঁর গুপ্ত বেদনার (দর্দ ই নিহাঁ) অংশীদার যে হতে পারে। ভারতের অন্তরের সম্পদের সঙ্গে অন্তরে তিনি এক ও অভিন্ন ছিলেন। কিন্তু বহিরঙ্গে তার প্রকাশ ভিন্ন ছিল। সেই কষ্টের তিনি কোনও অংশীদার পাননি।

অন্য এক কবিতায় ইকবাল নিজেকে সোমনাথি ও তাঁর বাপ দাদাকে লাতি ও মানাতি বলেছেন। তিনি সপরিবারে কোনও সময়ে পুণ্যতোয়া (আবে রুদার) গঙ্গার কাছে গিয়েছিলেন সে উল্লেখও করেছেন। বহির্জগতের পরিচয়ে যে তিনি ভারতের শাশ্বত কোনও পথ না পেয়ে মনোকষ্টে ভুগেছেন। তাঁর সেই গুপ্তবেদনা (দর্দ ই নিহাঁ) লাঘব করতে সক্ষম এমন কোনও মরমি বন্ধুকে তিনি পাশে পাননি। সমাজ নির্লিপ্ত ভাবে ইকবালের গান ও কবিতা পড়ে গেছে। তাঁর মর্মবেদনার শরিক হয়ে তা থেকে তাঁকে মুক্ত করার পথনির্দেশ করতে পারেনি। অভিমানে আহত ইকবাল ক্রমশ তাঁর প্রাণের হিন্দোস্তাঁ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। পরিণত বয়সে তাঁর মনে হয়েছে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য পৃথক দেশ ছাড়া গত্যন্তর নেই। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে এই আল্লামা লাহোরে দেহরক্ষা করেন।

আজও ভারতে এমন ভিত নড়ে যাওয়া লক্ষ লক্ষ ইকবাল আছেন যাঁরা হৃদয়ে গুপ্ত ব্যথা নিয়ে বাস করছেন। তাঁদের অস্মিতাকে মর্যাদা দিয়ে পথনির্দেশ করতে সক্ষম এমন কোনও মহরম বা সমব্যথী কি কোথাও কেউ আছে? □

কোনো কোনো পর্বতারোহীরাও জোচ্চুরি করেন

নিলয় সামন্ত

পর্বত আরোহণ একটা দুঃসাহসিক খেলা। ক্রীড়ামনস্ক ভ্রমণ পিপাসু মানুষদের পর্বত অভিযান খুবই মজার ও আনন্দের। এতে যেমন রোমাঞ্চ রয়েছে ঠিক তেমনই বিপদও রয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে পর্বত আরোহণে বিপদ আসে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে। কিন্তু অনেক সময়ই পর্বত অভিযাত্রীদের অনভিজ্ঞতা অথবা অন্যমনস্কতাও বিপদের কারণ হতে পারে। কখনও বা বেশি মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে অল্প সংখ্যক মানুষকে নিজের জীবনও বলিদান দিতে হয়। এত বিপদ তার সঙ্গে নানান বাধাবিপত্তি অতিক্রম করেও মানুষ আজও যাচ্ছেন পাহাড়ে। এক পর্বত অভিযাত্রীর কথায়, প্রথম প্রথম একটা ভীষণ ভালো লাগা। প্রাণ ভরে শ্বাস নিতে পারার আরাম। অপার্থিব সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যাওয়া। তবে বড্ড টানত পর্বতারোহণের গল্প-ছবি- সিনেমাগুলো। ট্রেকিং করতে করতে দূরের বরফচুড়ো দেখে নিজেই বুঝতে পারতাম, দূর থেকে দেখে যেন আর পোষাচ্ছে না। আরও আরও কাছে ডাকছে পাহাড়। ক্যামেরার লেন্স জুম করে ধরে ফেলা দৃশ্যগুলো চর্মচক্ষুর সামনে আসতে চাইছে। সোজা কথায়, শুধু আরাম আর ভালো-লাগা পেরিয়ে ঝুঁকির বাঁকগুলোও চিনে নিতে চাইছিলাম একটু করে। ভালোবেসে ফেলছিলাম পাহাড়কে। বিরাট কোহালি যখন প্রথম হাত রাখতেন ব্যাটের গ্রিপে, এমনটাই হতো কি তাঁর? আমার হলো। পাহাড়ে জড়িয়ে গেলাম। পর্বত অভিযানের এক শিক্ষার্থীর কথায়, একবার একটা রক ক্লাইম্বিং কোর্স করাতে গিয়ে সম্রাট বসুর সঙ্গে গল্প করছিলাম একটা পাথরে বসে। ইছাপুর অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরির তরফে দীর্ঘদিন ধরে পর্বতারোহণ করছেন। একাধিক সাত-হাজারি শৃঙ্গ ছোঁয়া হয়ে গিয়েছে। সম্রাটদা ক্লাইম্বিংয়ের জন্য জুতো বদলাচ্ছিল তখন। চোখে পড়েছিল পায়ের আঙুলের আধখাওয়া মাথাগুলো। এতদিনের পাহাড় জীবনের পাকাপাকি চিহ্ন এঁকেছে ফ্রস্ট বাইট। তুষারক্ষত। সম্রাটদা সেদিন বলেছিল, 'একটু চামড়া-মাংস হয়তো পাহাড় নিয়ে নিয়েছে, তাও আমার নিজেরই ভুলে। কিন্তু মানুষ হিসেবে তো আমাকে তৈরি করেছে এই পাহাড়ই।'

এই সব অভিযাত্রীরা আবার অনেকে জোচ্চুরিও করেন। না পৌঁছেই বলেন গিয়েছিলাম, জয় করেছিলাম। সাধারণ মানুষের পক্ষে এসব ধরা সম্ভব নয়। আর কে কোন পাহাড়ে উঠেছেন বা ওঠেননি তা নিয়েও সাধারণ মানুষের কোনও মাথাব্যথা নেই। কিন্তু বিষয়টা যখন হয় স্বীকৃতির তখনই বাধে গোলমাল। এমনটাই সম্প্রতি ঘটে গেল দুই ভারতীয় পর্বতারোহীর ক্ষেত্রে।

ভারতীয় পর্বতারোহী নরেন্দ্র সিংহ যাদব ও সীমা রানি গোস্বামীর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল নেপাল। ২০১৬ সালে মাউন্ট এভারেস্টের শিখর ছুঁয়েছিলেন বলে দাবি করেন এই দুই পর্বতারোহী। নিজেদের দাবি অনুযায়ী ছবিও জমা দিয়েছিলেন তাঁরা। সেই ছবি মিথ্যে বলে জানিয়েছেন নেপাল পর্যটন বিভাগের এক কর্তা।

হরিয়ানার এই পর্বতারোহীদের ২০১৬ সালে মাউন্ট এভারেস্ট জয়ের যে দাবি, তা মিথ্যে বলে জানিয়েছিলেন তাঁদের গাইড। সেই গাইডের বিরুদ্ধে মামলাও করেছিলেন নরেন্দ্র। নেপাল বিভাগের কর্তা প্রদীপ কুমার কৈরালা বলেন, 'এভারেস্ট জয়ের দাবি প্রমাণ করতে পারেননি নরেন্দ্ররা। যে ছবি ওঁরা জমা দিয়েছিলেন, তাতে গণ্ডগোল রয়েছে। ওঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

নেপাল পর্যটন বিভাগের তরফে জানানো হয়, যে ছবি নরেন্দ্ররা জমা দিয়েছিলেন সেখানে অক্সিজেন মাস্কের পাইপ ট্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। চোখের কালো চশমাতে বরফ বা আশপাশের পাহাড়ের কোনও প্রতিচ্ছবিও ছিল না, এমনকী হাতে ধরে থাকা পতাকা নুইয়ে পড়েছিল এমন একটা জায়গায়, যেখানে হাওয়া থাকে সবসময়। নেপালে প্রতি বছর এভারেস্ট জয়ের একাধিক মিথ্যে দাবি জমা পড়ছে বলে জানা গিয়েছে। আগে যেখানে ১২ বছরে কয়েকটা ভুয়ো দাবি পাওয়া যেত, এখন সেখানে প্রতি বছর গড়ে ১২টা পাওয়া যাচ্ছে বলে মত নেপাল পর্যটন বিভাগের। □

মাতৃসেবা সংকল্প যাত্রা

যেন কলিযুগের শ্রমণ। একই রকম তাঁর মাতৃভক্তি। মায়ের সাধ মেটাতে ভালো মাইনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে বৃদ্ধা মাকে স্কুটারে চেপে সারা ভারত ভ্রমণ করছেন তিনি। ৭০ বছরের মাকে নিয়ে ইতিমধ্যেই ঘুরে ফেলেছেন তিনি ৫২ হাজার ৩২ কিলোমিটার পথ। ছেলের কাছ মায়ের আবদার ছিল, জীবনের ৭০ বছর পেরিয়ে গেল কিন্তু বাড়ির আশেপাশের মন্দিরগুলিই দেখা হয়ে উঠলা না। ব্যাস, মায়ের এই খেদোক্তি শুনে কর্পোরেট জগতের মোটা মাইনের ছড়ে দিয়ে মাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ছেলে। সেই থেকে পথেই ঘরদোর মা রত্নচূড়া দেবী ও ৫১ বছরের ছেলে দক্ষিণামূর্তি কৃষ্ণকুমারের।

মা ও ছেলে কর্ণাটকের মহীশূরের বাসিন্দা। ২০১৮ সালে ১৬ জানুয়ারি কুড়ি বছরের পুরনো বাজাজ চেতক স্কুটারের পেছনে মাকে বসিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ছেলে। ২৫ মাসে পাড়ি দিয়েছেন ৫২ হাজার ৩২ কিলোমিটার পথ। দক্ষিণ ভারত, উত্তর ভারত ঘুরে এসেছি লেন নেপাল, ভুটান, মায়ানমার। বিভিন্ন রাজ্য পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়িতে সোমা সরকার নামে এক ফেসবুক বন্ধুর বাড়িতে ওঠেন। সেখান থেকে ভুটানের জয়গাঁ হয়ে ডুয়ার্স ভ্রমণ করেন। তারপর দার্জিলিং। চূড়ারত্নদেবীর এরমাত্র ছেলে তাঁকে ভারতদর্শন করাচ্ছেন এতে তিনি যারপরনাই খুশি ।

কৃষ্ণকুমার বলেন, বাবার মৃত্যুর পর মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, দেশের কোন তীর্থস্থান দেখতে চাও তুমি? মা

বলেন, ‘বাবা, তুমি আমাকে আশেপাশের মন্দিরগুলিই আগে দেখাও, এই বুড়ো বয়সে নামকরাগুলো আর নাই-বা দেখলাম।’ ‘মায়ের কথা শুনে আমার বিবেক দংশন হয়। তখনই সিদ্ধান্ত নিই, মাকে স্কুটারে চাপিয়ে দেশের সব উল্লেখযোগ্য তীর্থস্থানগুলি দেখাবো।’ তাপর চাকরি ছেড়ে দিয়ে মাকে নিয়ে সারা দেশ ঘুরতে শুরু করেছেন কৃষ্ণকুমার। কিন্তু বাহন হিসেবে স্কুটার কেন? কৃষ্ণকুমার জানান, আজ থেকে কুড়ি বছর আগে স্কুটারটি কিনে দিয়েছিলেন বাবা। ২০১৫ সালে তিনি গত হন। আমি বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। স্কুটারটি সঙ্গে থাকলে মনে হয় পুরো পরিবার এরসঙ্গে রয়েছি।’

তিনি বলেন, বাবা-মা আসলে প্রত্যক্ষ দেবতা। আমার মনে হয় প্রতিটি সন্তানের দিনে অন্তত কিছু সময় একান্তে মা-বাবার সান্নিধ্যে থাকা উচিত। তাঁরা বেঁচে থাকতে তাঁদের জন্য কিছু না করে মৃত্যুর পর ঘটা কর কয়েকশো লোককে খাইয়ে সকালে-বিকেলে ফোটোতে ফুল-মালা দেওয়া ঠিক কাজ নয়।’

বিভিন্ন সমস্যা সত্ত্বেও অনেকেই সাইকেলে অথবা মোটর সাইকেলে কিংবা পায়ে হেঁটে গোটা দেশ ঘুরে বেড়ান। কিন্তু মায়ের ইচ্ছা পূরণের জন্য কোনো ছেলের এমন অভিনব সংকল্প আগে দেখেছেন বলে কেউ মনে করতে পারছেন না। কৃষ্ণকুমার নিজেই এই সফরের নাম দিয়েছেন যা বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায় **মাতৃ সেবা সংকল্প যাত্রা।**

পাহাড়ি উপত্যকা থেকে বৃষ্টিবহুল এলাকা— মাকে পেছনে বসিয়ে অবিরাম ছুটে চলেছে একমুখ দাড়িভর্তি পুত্রের স্কুটার। আনন্দে উজ্জ্বল মা ও ছেলের মুখমণ্ডল।

সংগৃহীত

ভারতের পথে পথে

মণিমহেশ

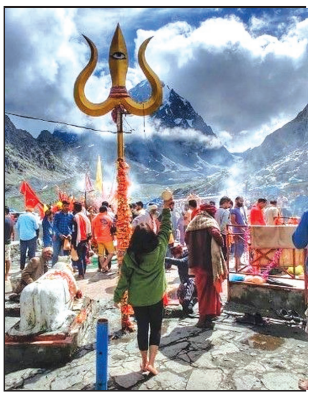

তুষারমৌলী কৈলাস পর্বতের ঢালে নয়নলোভন প্রকৃতির মাঝে মণিমহেশ। ভারমোর থেকে পায়ে হেঁটে মণিমহেশে যেতে হয়। সারা পথের নৈসর্গিক শোভা যাত্রীদের ক্লান্তি হরণ কর। এখান থেকে কৈলাস দর্শন করা যায়। ভারমোরের প্রাকৃতিক শোভা নয়নাভিরাম। এখানে রয়েছে লিঙ্গরাজ মণিমাহেশ, গণেশ, শীতলা, সূর্যলিঙ্গ, জ্যোতির্লিঙ্গ, ব্রাহ্মণীমাতা, চামুণ্ডা, নৃসিংহ ও মহিষাসুরমর্দিনী মন্দির। কারুকার্যময় শিখরধর্মী কাঠের তৈরি পাহাড়ি শৈলীর মন্দির। রয়েছে মানবদেবতা নাগাবাবা অর্থাৎ মারাঠি সন্ন্যাসী জয়কৃষ্ণগিরির মর্মরমূর্তি। রয়েছে ব্রাহ্মণীধারা। মণিমহেশ যাত্রীদের ব্রাহ্মণীধারায় স্নান ও দেবীর পূজার দেওয়া বিধি। আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে মণিমহেশ লেকের পাড়ে মেলা বসে।

জানো কি?

ভারতের উল্লেখযোগ্য নদীর উৎস মোহনা ও দৈর্ঘ্য

- সিন্ধু --- মানসসরোবর --- আরব সাগর— ২৮৮০ কিমি।
- নর্মদা--- অমরকণ্টক--- কাম্বে উপসাগর— ১৩১২ কিমি।
- তাপ্তি--- মহাদেব পর্বত--- কাম্বে উপসাগর— ৭২৪ কিমি।
- লুনি—পুষ্কর ভ্যালি— কচ্ছের রান— ৪৯৫ কিমি।
- ঝিলাম—ভেরিনাগ— প্রস্রবণ— চেনাব নদী— ৭২৫ কিমি।
- দামোদর— খামারপাত শৃঙ্গ— গঙ্গা— ৫৯২কিমি।

ভালো কথা

আনন্দ

অযোধ্যায় রামমন্দির তৈরির জন্য দেশজুড়ে অর্থ সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়েছে। আমারও খুব ইচ্ছা ছিল মন্দিরের জন্য কিছু দেবার। সেদিন পাড়ার দাদারা আমাদের বাড়ি এলে আমি আমার কুপে জমানো সব টাকা তাদের তাদের হাতে তুলে দিয়েছি। অভিযানে আসা দাদারা ও পাড়ার সবাই আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে ।

সৃজা অধিকারী, চতুর্থ শ্রেণী, গড়বেতা বাজার, পঃ মেদিনীপুর

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

পড়ার সঙ্গে খেলা

সোহম দাস, ষষ্ঠশ্রেণী, ফরাক্কা ব্যারেজ কলোনি, মুর্শিদাবাদ

মা বলে পড় পড়
বাবা বলে একটু খেলো,
পিসি বলে মোটেই নয়
ঠাম্মা বলে কেন নয়?

একটুখানি খেললে পরে
মনটা ভালো থাকবে
কাকা বলে পড়ার সঙ্গে
একটু খেলতে হবে।

কবিতা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। শ্রীগুরুজী।। ৩।।

ছেলের উৎসাহ দেখে মধুর বাবা ওকে ইংরিজি গল্পের বই কিনে দিলেন। একদিন 'ভাই এবং বোন' নামের একটি গল্প পড়ছিল মধু—

ভাই-বোন জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলল। ভাইয়ের তেষ্টা পেয়েছিল। নদীর জল খাওয়া মাত্র ভাই হরিণ হয়ে গেল...

তাহলে বোনটার কী হল?

মধু কাঁদতে লাগল।

বাবার বদলির চাকরি। তাই মধুকেও রায়পুর, নাগপুর, খাণ্ডোয়া... এরকম নানা জায়গার স্কুলে পড়তে হয়েছিল। খাণ্ডোয়ার স্কুলে পড়ার সময় মধু চতুর্থ শ্রেণীর পরীক্ষায় পাশ করে।

একদিন ক্লাসে বসে সে লিখছে—

১৯১৩ সাল। মধু সেবার খুব অসুস্থ। দিনের পর দিন জ্বর—

১৯১৫ সালে মধুর উপনয়ন হলো—

উপনয়নের সময় মধু যা অঙ্গীকার করেছিল, সারাজীবন তা রক্ষা করেছে।

ক্রমশ

রামমন্দির না দেখেই চলে গেলেন গজানন বাপট

উত্তম কুমার মাহাতো

প্রবীণ প্রচারক গজানন দিনকর বাপট ১৯৬৫ সালে ডিসেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গে আসেন। প্রথমে দার্জিলিং জেলা প্রচারক, পরে জলপাইগুড়ি বিভাগ প্রচারক, হাওড়া বিভাগ প্রচারক, নবদ্বীপ বিভাগ প্রচারক এবং ১৯৮৬ সালে বর্ধমান সম্ভাগ প্রচারকের দায়িত্ব পালন করেন। সঙ্ঘের যোজনাতে ১৯৮৭ সালে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের সহ-প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে কল্যাণ আশ্রমের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীকালে ১৯৯৮ সালে বিহার, ওড়িশা ক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। রাঁচীকে কেন্দ্র করে সফলতার সঙ্গে কাজ করেন। ২০০০ সালে উত্তর-পূর্ব ক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাত রাজ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে কাজের ভিত্তিস্থাপন করেন। ২০১৩ সালে অখিল ভারতীয় ব্যবস্থা প্রমুখের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তী সময়ে অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার সদস্য ছিলেন। শেষ দিনগুলো বরিষ্ঠ প্রচারক হিসেবে সকলের অভিভাবক হয়ে কলকাতা কল্যাণ ভবনেই থাকতেন।

গজাননদা মানে একশো শতাংশ ব্যবস্থিত। খুব শরীর খারাপ না থাকলে কোনোদিন কোনো কার্যক্রমে দেরিতে পৌঁছাননি। একাত্মতা স্তোত্রমে ঠিক সময়ে বসা, শাখাতেও তাই। সাংগঠনিক কাজে ও ব্যক্তিগত কাজে সময়ের ব্যপারে কোনো সমঝোতা করেননি শরীর যতদিন চলেছে। জলযোগ ও ভোজনে কখনো ১ মিনিট দেরি আমি দেখিনি। এতটাই ব্যবস্থিত যে মৃত্যুর বেশ কয়েক মাস আগে থেকে কল্যাণ ভবনের ব্যবস্থাপক বরুণকে বলছেন আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটা বন্ধ করে দাও। বন্ধ করে দেওয়ার পর বললেন— যে-কোনোদিন চলে যাব তো। তাই হলো, গজাননদা চলে গেলেন।

হিন্দু, হিন্দুত্বের ব্যাপারে কখনো সমঝোতা করেননি। উত্তর পূর্ব ভারতের ঘটনা— নাগাল্যান্ডে একজন কার্যকর্তার হাসপাতালে মৃত্যু হয়। মৃতদেহ বাড়িতে পাঠানোর জন্য কফিন বন্দি করার সময় খ্রিস্টান নার্স ও ডাক্তাররা কফিনের উপর ক্রশ লাগানোর সময় তীব্র বিরোধিতা করেন এবং ওখানে ৯০ শতাংশের বেশি খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের কাছে হিন্দুত্বের পরিচয় দিয়ে ক্রশ লাগাতে দেননি।

খুব জেদি ছিলেন। সূর্য সিদ্ধান্ত ভারতীয় ক্যালেন্ডার চালু হওয়া উচিত। এই সিদ্ধান্তকে সরকারি ভাবে প্রয়োগ করার জন্য ১ মে ব্যাঙ্কের চেকে ওই তারিখ লেখেন। ব্যাঙ্ক ফেরত করে দেয়। পরবর্তী সময় আবার লেখেন এবং ব্যাঙ্কে গিয়ে বলেন চেকে কী ভুল আছে? তারা বলেন, তারিখ ইংরেজিতে লিখতে হবে। তিনি বলেন না আমি সূর্য সিদ্ধান্ত তারিখ দেবো, আপনি লিখে দেন এতে হবে না। পরবর্তী সময়ে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে কার্যালয়ে ফেরেন।

কয়েক মাস আগে বসন্তদার জীবনী ভিত্তিক বই 'সবার আপনজন' সংকলনের সময় রাতদিন এক করে কাজ করেছেন। লেখা জমা দেওয়ার তারিখ পেরিয়ে যাওবার পরও বলতেন তোমার জন্য ২ দিন বাড়িয়েছি। এভাবে ১৩০ জনের কাছ থেকে লেখা সংগ্রহের এক অসাধ্য সাধন করে গেলেন তিনি।

সেবাভাবী ছিলেন। পূর্বক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক ছিলেন ডাঃ রামগোপালজীর। খুবই শরীর খারাপ ছিল। রাতে ঘুমাতে পারতেন না। শেষ সময় নিজের কাজগুলোও করতে পারতেন না। একই ঘরে পাশাপাশি থাকার কারণে সব কাজেই গজাননদা সহযোগিতা করতেন। রামগোপালজীর শরীর এতই খারাপ ছিল— ভালো কথা বললেও রেগে গিয়ে গজাননদাকে বকাবকি করতেন। পিতা যেমন অসুস্থ পুত্রের সেবা করেন, তেমনি একজন বড়ো দায়িত্বে থাকা নিজের কার্যকর্তাকে আগলে রাখার কাজ করে গেছেন।

সকলের জন্য চিন্তা করতেন গ্রাম থেকে কলকাতা শহরে বিভিন্ন কাজে কল্যাণ আশ্রমও সঙ্ঘের কার্যকর্তারা এলে সব খবর নিতেন। সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলতেন, ৫৫ বছর ধরে অনেক প্রজন্মের সঙ্গে কাজ করেছেন। আমি কখনও শুনিনি— আমার সময় এরকম ছিল, এখন আর কোথায় হচ্ছে এসব। গত তিন বছর ধরে দেখছি সকলের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার এক অদ্ভুত ক্ষমতা।

তিনি মিতব্যয়ী ছিলেন। তিনি আমাকেও বলেছেন, আমি কিন্তু কৃপণ প্রচারক। তাঁর ঘরে চেয়ারগুলোতে নতুন কভার দিতে চেয়েছিলাম— উনি লাগাতে দেননি। চিকিৎসার সময় বলতেন কত খরচ হলো— আমরা হিসাব দেখাতাম না, কিন্তু আন্দাজ করে উনি লিখে রাখতেন, খরচ কম হলে মানসিক শান্তি পেতেন।

অতিমারীর সময় একদিন কথা হচ্ছে। খোস মেজাজ জিজ্ঞাসা করলাম, গজাননদা আপনার খুশির দিনটা মনে আছে? উনি বললেন, প্রচারক জীবনটাই আমার খুশির দিন। পুরুলিয়া জেলাতে জনজাতি সম্মেলনে ২০,০০০ সংখ্যা মঞ্চ থেকে দেখেছি, আর আনন্দে মন ভরে যাচ্ছে, আর মনে মনে ভাবছি— যোগ্য লোকেদের হাতেই সংগঠনের দায়িত্ব দিয়েছেন অধিকারীরা। মনে মনে ভাবতাম আমার পর কার হাতে দায়িত্ব পড়বে সংগঠনের একটা মানসিক স্বস্তি সেইদিন পেয়েছিলাম। আর কি হলে ভালো? তখন বলেছিলেন সারা ভারত গেরুয়াময় দেখতে চাই, আর ভব্য রামমন্দির। হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে কার্যকর্তাদের বললেন, রামমন্দির তো হচ্ছেই, কিন্তু আমার মনে হয় দেখা হবে না। তাই হলো গজাননদা আমাদের ছেড়ে স্বর্গলোকে চলে গেলেন। □

শ্রীশ্রীকরুণাময়ী মন্দির ইতিহাসের নীরব সাক্ষী

জয়ন্ত পাল

সেদিন ঘুরে এলাম বেহালার পুঁটিয়ারী অঞ্চলে শ্রীশ্রী করুণাময়ী মন্দিরে। মন্দিরে মাকে প্রণাম করতে করতে ইতিহাসের মধ্যে ডুব দিলাম। বাঙ্গলার রাজা বল্লাল সেন দক্ষিণের বঙ্গোপসাগর থেকে উত্তরে গঙ্গার পূর্বতীরে অবস্থিত সাহেমান বাগিচা যা দক্ষিণেশ্বর অবধি যে ত্রিকোণাকৃতি অঞ্চলটি দান করেছিলেন এক ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে শাক্ত সাধনার জন্য, যার মধ্যস্থল হচ্ছে কালীঘাট। এই নামটি কালীক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ এই কালীক্ষেত্র উত্তরে দক্ষিণেশ্বর, মধ্যে কালীঘাট এবং দক্ষিণে করুণাময়ী মন্দির অবস্থিত।

দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রায় ৯৫ বছর আগে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে সাবর্ণ রায়চৌধুরীর মাধ্যমে এই করুণাময়ী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দ্বাদশ শিবমন্দির যুক্ত করুণাময়ী মন্দিরের শোভা দেখে রানি রাসমণি দক্ষিণেশ্বরের নকশা তৈরি করেন। এই মন্দিরের বিশেষ তাৎপর্য হলো এক খণ্ড কষ্টিপাথরকে খোদাই করে মহাকাল ও মহাকালীর মূর্তি তৈরি করা হয়েছে। এই মূর্তির শিল্পকর্ম এতই উন্নতমানের যে দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিভাবে আপ্লুত হতে হয়। দু-দুবার প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে মন্দির ভগ্নপ্রায় হয় এবং তাকে পুনর্নির্মাণ করা হয়। বর্তমান মন্দিরটি নবকলেবর ধারণ করে ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে। প্রায় আড়াইশো বছর পুরানো মন্দিরে দাঁড়ালে ইতিহাস ফিস ফিস করে কথা বলে। তাই এই মন্দির জুড়ে নানা অলৌকিক কাহিনি লোকের মুখে ফেরে।

বাম জমানায় অনেক অত্যাচার সহ্য করে বর্তমান ট্রাস্টির বাবা অসিত রায়চৌধুরী বুক দিয়ে এই মন্দিরকে বাঁচালেও অনেক জমি বেদখল হয়ে যায়। বর্তমানে শ্রীশ্রী করুণাময়ী ঠাকুরানি ট্রাস্টের ম্যানেজিং ট্রাস্টি অশোক রায়চৌধুরী শুধু মন্দিরকে রক্ষা করছেন না তিনি তিল তিল করে পয়সা জোগাড় করে দ্বাদশ শিব মন্দিরকে বাঁকুড়ার টেরাকোটা কাজের মাধ্যমে নবরূপে সজ্জিত করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণভাব আন্দোলনের সহভাগী হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের দেখানো পথে শিবজ্ঞানে জীবসেবা করে চলেছেন নিরলস ভাবে। সেটা নিরন্নের মুখে অন্ন তুলে দেওয়া থেকে শুরু করে আমফান তথা প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুর্গতদের পাশে থেকে মানুষের সেবায় সর্বদা নিবেদিত প্রাণ। বর্তমানেও বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও এই ট্রাস্ট নিরন্তর সেবাকাজ করে চলেছে মা করুণাময়ীর আশীর্বাদে। মায়ের মূর্তির দিকে তাকালে মনে হয় মা যেন বিগত আড়াইশো বছরের একটি জীবন্ত ইতিহাস। যিনি নীরব হয়ে এই অঞ্চলের উত্থান-পতনের সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত। তাই নিজের অজান্তে দুটো হাত জড়ো হয়ে প্রণাম করার সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটি অশ্রুসজল হয়ে যায়।

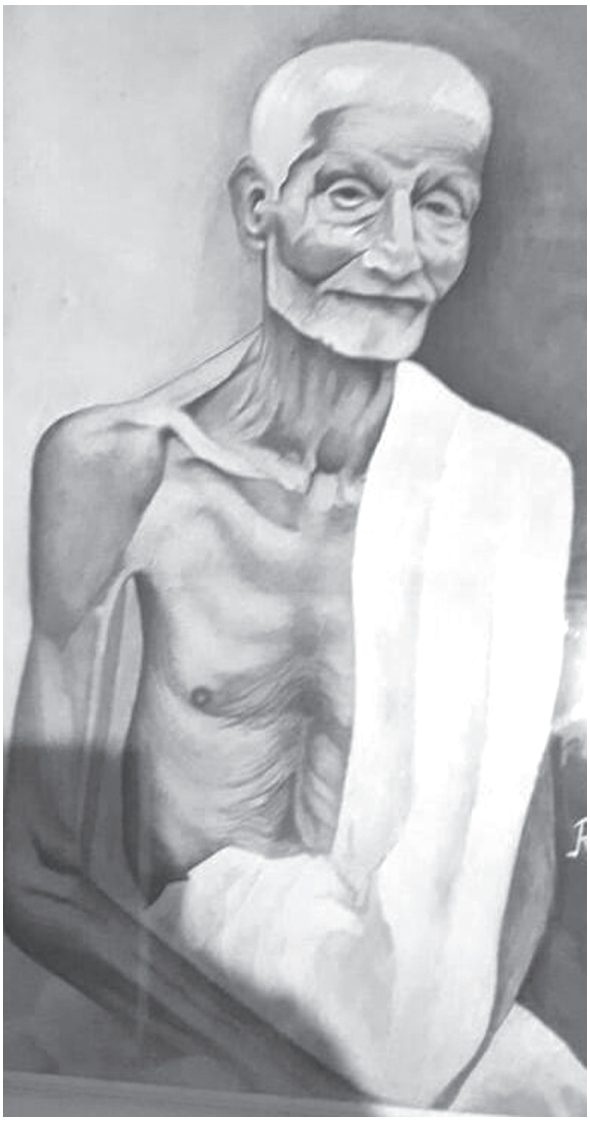

বাঙ্গালির সারস্বতচর্চার এক অবহেলিত অধ্যায়

মানিক হালদার

২০১৬ সাল। সদ্য এম.ফিল কোর্স ওয়ার্ক সমাপ্ত করে আমার গাইড শ্রদ্ধেয় চন্দন ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলোচনার পর সিদ্ধান্তে উপনীত হই, সংস্কৃতচর্চায় গৌড়ীয় পণ্ডিত সমাজ নিয়ে কাজ করার। ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে প্রথম গৌড় নামের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করি, তাই গৌড়ের ভূমিপুত্র হওয়ায় আমার ভূমিমাতার অতীত গৌরব ও ঐতিহ্য জানতে যথেষ্ট ভাবেই উৎসাহিত হই। ক্রমানুযায়ী প্রাচীন, মধ্য ও পরিশেষে আধুনিক গৌড়ীয় পণ্ডিত সমাজে বা মালদহের পণ্ডিত সমাজে প্রবেশ করলে ঘনাদার নাম উঠে আসে। শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব চক্রবর্তীর নিকট প্রথম ঘনাদার নাম শুনি। ঘনাদা মালদহের বিখ্যাতলব্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন।

শব্দশাস্ত্রের ইতিহাস রচয়িতা কালিজয় দেবশর্মা সংস্কৃত ভাষায় শরৎ কুমার ভট্টাচার্যকে প্রশংসা পত্র প্রদান করেন এবং ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে রামকেলি সংস্কার সভ্যবৃন্দ মানপত্র ও সংবর্ধনা প্রদান করেন।

অতঃপর ঘনাদার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি। কে এই ঘনাদা? স্বর্গীয় তুষারকান্তি ঘোষ, প্রাক্তন মালদা জেলা গ্রন্থাগারিক শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য, গবেষক গোপাল লাহা প্রমুখ গুণীজনের কাছে মালদার বিষয়ে জানার চেষ্টা করি। অবশেষে ইতিহাসবিদ স্বর্গীয় কমল বসাকের কাছে ঘনাদার নিবাসের সন্ধান পাই। তারপর ছুটলাম মালদা শহরের ফুলবাড়ি নিকটবর্তী মিস্ত্রিপাড়ার উদ্দেশে, ঘনাদার বাড়িতে। দেখলাম শয্যাশায়ী ঘনাদার ছেলে অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছে আর তার পরিচর্যায় নিয়োজিত আছে ঘনাদার নাতনি। ঘনাদার ছেলের সঙ্গে আর কথা বলা হলো না, কারণ তিনি শয্যাশায়ী। ঘনাদার ছেলে কানু মাস্টার নামে পরিচিত। তিনি টাউন স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। অবসর নেওয়ার পর বার্ধক্যজনিত নানা উপসর্গে শয্যাশায়ী হয়ে আছেন এবং তার সেবাতে নিয়োজিত আছেন গোপাদি। গোপাদি ঘনাদার ছেলে কানু মাস্টারের মেয়ে। বিয়ে করেননি গোপাদি।

গোপাদির সঙ্গে আমার বেশ সখ্য হলো। তিনি ঘনাদার বিস্তারিত বিবরণ আমায় জানালেন। ঘনাদার পিতৃ প্রদত্ত ডাকনাম ঘনানন্দ কিন্তু পাড়ার লোকেরা তাকে ঘনাদা বলে ডাকত। ঘনাদার পোশাকি নাম শরৎ কুমার ভট্টাচার্য। এই নামেই ঘনাদা অধিক পরিচিত ছিলেন তবে অনেকে আবার শরৎ পণ্ডিত বলেও জানত। ঘনাদার জন্মের সময় আমাদের দেশ ছিল ব্রিটিশ পদানত। তারা আমাদের সংস্কৃত ভাষার বিলুপ্তি ঘটাতে উদ্যোগী হয়। সে সময়ে আমাদের জেলাতে চতুষ্পদী টোল শিক্ষা ব্যাবস্থার অধিক প্রচলন ছিল কিন্তু আজ তা ধ্বংসপ্রাপ্ত। বিশেষ করে দেশভাগের পূর্বে অবিভক্ত মালদার আইহো সীমান্তবর্তী ভোলাহাট, ইংরেজবাজার পৌরসভার গয়েশপুর, চাঁচলের কলিগ্রাম, হরিশচন্দ্রপুর প্রভৃতি স্থানে সংস্কৃত টোল ছিল। দেশ ভাগ হওয়ার পর টোলগুলিও বন্ধ হয়ে যায়।

ঘনাদার জন্ম ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে। পিতা অভয়ানন্দ ভট্টাচার্য্য

ব্যাকরণ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং মাতা ছিলেন কৃষ্ণাময়ী দেবী। তৎকালীন ব্রাহ্মণ সমাজে অভয়ানন্দের সুখ্যাতি ছিল। তিনি যজন-যাজন করে জীবন অতিবাহিত করতেন। বরেন্দ্রভূমি ত্যাগ করে মালদার বাচামারীতে বাস করতেন এবং মহানন্দার শীতল বাতাসে নিজেকে সম্পৃক্ত করতেন। তিনি আত্মকাহিনিতে ব্যক্ত করেছেন— শাণ্ডিল্য গোত্র সম্ভূতা বরেন্দ্রভূমিবাসিনঃ শাস্ত্রজ্ঞা ব্রাহ্মণাশ্চোসন মম পূর্বর্বা পিতামহাঃ।। মালদহং সমাগম্য বাচামারীমুপ্যবসন/... জাতিক্রমেন সন্বিতা। নির্মল বায়ু সেবিতা।। পরবর্তীতে তাঁর ছেলে ইংরেজবাজার পৌরসভার ১১নং ওয়ার্ডের ফুলবাড়ি নিকট মিস্ত্রিপাড়াতে বসতি স্থাপন করেন। আট বছর বয়সে তার উপনয়ন সংস্কার সাধিত হয়। ঘনানন্দ ছিলেন মা কালীর সাধক। মায়ের কৃপাতেই হয়তো ক্রমে পাণ্ডিত্য বর্ধিত হয়েছে এবং শরৎ পণ্ডিত নামে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে ১৭ বছর বয়সে চাঁচলের বকচরার অধিবাসী ঘনশ্যাম পণ্ডিতের কন্যার সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। বিয়ের পরও তিনি পড়াশোনা চালিয়ে যান। শিক্ষার দিক দিয়ে উচ্চশিক্ষিত না হলেও কলিগ্রামের মিডল ইংলিশ স্কলারশিপ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। তারপর ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে কাব্য পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে রৌপ্য পদক লাভ করেন এবং ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে স্মৃতি পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে বেদান্ত পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। অধ্যয়নের পাশাপাশি তিনি যজন-যাজন এবং দারিদ্রের জন্য চাঁচল রাজপরিবারের অধীন কাজ করতেন কিন্তু রাজার হস্তক্ষেপে তার চাকরি চলে যায়। তারপর শিক্ষকতা শুরু করেন জাতীয় পাঠাগারে কিন্তু সেটাও বন্ধ হয়ে গেলে চরম দারিদ্রের সম্মুখীন হতে হয়, তাই কেবল যজন-যাজন করে জীবন অতিবাহিত করতে থাকেন। এরূপ অবস্থায় মালদা জেলা স্কুলের পণ্ডিত দেবশর্মা লিভ ভ্যাকেন্সিতে গেলে তিনি সেখানে শিক্ষকতার সুযোগ পান কিন্তু দেবশর্মা পরলোকগমন করলে তিনি স্থায়ীভাবে জেলা স্কুলের শিক্ষকরূপে অধিষ্ঠিত হন। তিনি দীর্ঘ আঠোরো বছর জেলা স্কুলে শিক্ষকতা করেন। শিক্ষকতায় বিশেষ পারদর্শিতার কারণে স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাঁকে প্রশস্তি পত্র প্রদান করেন— This is to be certified that pandit Sharat Kr. Bhattacharya kavya Thirtha served under me as offg. Head pandit of the Month during the absence of leave the permanent incombet. He is a young and intelligent officer. He knows Sanskrit well.

এছাড়া ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে সিভিল সার্জেন্ট আনন্দলাল বোস তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে প্রশস্তি পত্র প্রদান করেন। তৎকালীন জমিদার কৃষ্ণলাল চৌধুরীও পাণ্ডিত্যের জন্য মানপত্র প্রদান করেন। এভাবে ঘনাদা মালদাবাসীর হৃদয়াসনে শরৎ পণ্ডিত নামে অধিষ্ঠিত হন। তিনি তার জীবনপথে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে অতিবাহিত হতে হতে শেষ বয়সে সুগম পথে প্রবেশ করে তিনি তাঁর অভিলাষ ব্যক্ত করতে 'ঘনানন্দ প্রলাপঃ স্তোত্রাঙ্কুরশ্চ' নামে স্তোত্রকাব্য রচনা করেন। তিনি আক্ষেপের সঙ্গে বলেছেন 'বর্তমান সময় দেব-দেবীর কেউ ধার ধারে না, দেব-দেবীর স্থলে বিজ্ঞান অধিকার করেছে। এযুগের দেব-দেবীর পুস্তক বাতুলতা জানিয়াও মনের আবেগে রচনা করিয়াছি।' সংস্কৃত সাহিত্যে স্তোত্র কাব্য প্রথম ঋক্‌বেদে পাওয়া যায়, বেদেও বিভিন্ন দেব-দেবীর স্তুতি গাওয়া হয়েছে। এই জাতীয় রচনা সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে ঐশ্বর্যরূপে পরিগণিত হয়। এই গ্রন্থে ঘনাদা বিভিন্ন দেব-দেবীর স্তুতি গেয়েছেন এবং ব্যাকুল প্রার্থনা জানিয়েছেন ভুলত্রুটি হলে দেব-দেবী যেন ঘনাদাকে ক্ষমা মার্জনা করেন। তিনি বলেছেন— 'মা' এর উপাসনা করিয়া যে যে ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াছি তাহাই লিখিয়াছি। বেদে যে রূপ মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষিদের বাণী গীত হয়েছে তেমনি ঘনাদার কাব্যেও বিভিন্ন দেবদেবীর স্তুতি গীত হয়েছে।

শ্যামার রূপ বর্ণনা, সৃষ্টি রহস্য, নববর্ষ প্রার্থনা, শ্রীকৃষ্ণ প্রার্থনা, শ্রীবিষ্ণু প্রার্থনা, শীতলা স্তোত্রম, জহরা স্তোত্রম, সূর্য্য স্তোত্রম, শ্রীরাধিকা স্তোত্রম, হনুমৎ স্তোত্রম, দশমহাবিদ্যা স্তোত্রম প্রভৃতি দেব-দেবীর স্তোত্র গ্রন্থিত করেছেন তাঁর কাব্যে। ঘনাদার মতে— ''সকলের অভীষ্ট দেব একজন, উপাসকের গুণ অনুসারে উপাসনার জন্যই একজনই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছেন। পঞ্চোপাসকের জন্যই উপাসনা প্রণালীর ভেদ হইয়াছে। পঞ্চোপাসকেরা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুধা ভেদ স্থাপন করিয়াছেন এবং তাহারা প্রকৃত উপাসনা না করিয়া নিজ নিজ সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য দেখাতে ব্যস্ত থাকেন এবং মূল উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হন। ইহাতে দেশের অনৈক্য বৃদ্ধি পায় এবং অনৈক্যের জন্য আমরা দুর্বল হই। আমরা ক্রমশ বাহ্যিক বিষয়ে মনোযোগ দিই এবং মূলতত্ত্ব বিস্মৃত হই। আধুনিক মঠাধীশরা নিজেদের মতই নির্ভুল মনে করিয়া নিজমত স্থাপনে ও পরনিন্দাতেই কাল অতিবাহিত করেন এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া নিজের ও দেশের অমঙ্গল বিধান করেন। আমি কৃতাঞ্জলিপুটে সকল মঠাধীশের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহারা মক্ষিকাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া মধুমক্ষিকা বৃত্তি গ্রহণ করুন এবং আত্মপ্রচার না করিয়া পরমাত্মার পরম তত্ত্ব অকপট চিত্তে ও অহংকার শূন্য হইয়া প্রচারে ব্রতী হউন।'' তিনি গৃহস্থ জীবনযাপন করেও প্রকৃত ধর্মের পথ দেখিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টি 'ঘনানন্দ প্রলাপঃ স্তোত্রাঙ্কুরশ্চ' কাব্যের সুখ্যাতি বঙ্গ হতে বহির্বঙ্গে সমাদর লাভ করে। বারাণসী হতে গোপীনাথ কবিরাজ পত্রের মাধ্যমে প্রশংসা জ্ঞাপন করেন। অপরদিকে প্রখ্যাত ভাষাবিদ ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রশংসা পত্র পাঠান যা তৎকালীন উদয়ন সাপ্তাহিক পত্রিকা ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ জানুয়ারিতে প্রকাশ করে।

এছাড়া শব্দশাস্ত্রের ইতিহাস রচয়িতা কালিজয় দেবশর্মা সংস্কৃত ভাষায় তাঁকে প্রশংসা পত্র প্রদান করেন এবং ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে রামকেলি সংস্কার সভ্যবৃন্দ মানপত্র ও সংবর্ধনা প্রদান করেন। তাঁর অসংখ্য রচনাবলী সংরক্ষণের অভাবে লুপ্ত হয়ে গেছে। তিনি কবে সঠিক কখন অমৃতলোকের পথ পাড়ি দিয়েছেন তা জানা যায়নি। তবে ঘনাদার সন্ধানে বেরিয়ে পেলাম এক উদারচেতা গৃহস্থ সন্ন্যাসী ধার্মিককে যিনি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মতো প্রকৃত ধর্মের পথকে সুগম করেছেন। তাই তিনি সংস্কৃত সাহিত্যচর্চায় বঙ্গ তথা মালদার ইতিহাসে সদা পূজনীয় থাকবেন। ▫

বাঙ্গালির মন থেকে রামকে মুছে দেওয়া সম্ভব নয়

ড. বিনয় বর্মন

প্রকৃত সংস্কৃতি কী? এর স্বরূপই বা কেমন? বেশ কিছুদিন ধরেই কয়েকটি প্রশ্ন সংস্কৃতিপ্রেমী বাঙ্গালির মুখে মুখে ঘুরছে। 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি বাঙ্গালির সংস্কৃতি নয়। 'মা দুর্গা' বাঙ্গালির আসল সংস্কৃতি। কেউ বলছে না এর কোনোটাই বাঙ্গালির সংস্কৃতি নয়। বাঙ্গালির সংস্কৃতি কবিতা, সাহিত্য, নাটকে। পত্রিকা বা সোশ্যাল মিডিয়ায় বড়ো বড়ো করে প্রচার হচ্ছে বাঙ্গলার সংস্কৃতির নানা রূপ নিয়ে।

আসলে সংস্কৃতি বিষয়টি কেবল দুটি পত্রিকা আর সোশ্যাল মিডিয়ার পাঠ থেকে বোঝা সম্ভব নয়। এটি বুঝতে গেলে একটু গভীর ভাবে ভাবতে হবে। সংস্কৃতির কোনো নির্দিষ্ট সীমানা নেই। আপনি বা আপনারা-আমরা যা করছি, যে জীবনযাপন করছি তাই আপনার আমার সংস্কৃতি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যখন রামনামে বিতর্ক সৃষ্টি হয় বা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাবাবেগকে আঘাত করে কার্টুন চিত্র প্রকাশ করা হয় তখন তা আপনার আমার জীবনযাপনের সংস্কৃতিকে বোঝায় না। তখন বিতর্কের জন্ম নেয় ধ্রুপদী সংস্কৃতিকে নিয়ে। প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দেয় ভারতীয় চিরন্তন পরম্পরা নিয়ে। বর্তমানে এখানে অনেকে পশ্চিমবঙ্গকে ভারত থেকে স্বতন্ত্র মনে করতে শুরু করেছে। আমার আপনার পিতৃপুরুষের পালনীয় সংস্কৃতি, ধর্ম বা জীবনমূল্য নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। আর এই জায়গা থেকে ভাবলে

যতদিন পৃথিবী পৃষ্ঠে পর্বত থাকবে, যতদিন নদীগুলি প্রবাহিত হতে থাকবে, ততদিন রামায়ণের কাহিনি জনমানসে প্রচারিত হবে। রামায়ণ কেন্দ্রিক বাঙ্গালি সংস্কৃতিও অক্ষয় অমর হয়ে থাকবে। কোনো অপসংস্কৃতির প্রভাব এর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

এই বিতর্কের আসল সমাধান হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে। কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি শুনলে খেপে যাচ্ছেন, রাস্তায় কনভয় দাঁড় করিয়ে ছেলেদের উত্তমমধ্যম দেওয়ার দাওয়াই দিচ্ছেন। এই বিতর্কের জন্ম সেখান থেকে। তারপর থেকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে একটি বার্তা সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়— 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি বাঙ্গলার সংস্কৃতি নয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো মুখ্যমন্ত্রী কেন এর বিরোধিতা করছেন? তিনি তো নিজে একজন হিন্দু। আর রামচন্দ্র সমগ্র ভারতবর্ষের প্রাণের দেবতা এবং ভারতবাসীর পূর্বপুরুষ। তাহলে বিরোধিতা কেন? আসলে এই বিরোধিতার মূল কারণ রাজনৈতিক। রাজনৈতিকভাবে একটি দলের বিরোধিতা করতে গিয়ে তিনি ভগবান রামচন্দ্রের বিরোধিতা করে বসলেন। কিন্তু তিনি রাজনীতিকে রাজনীতি দিয়ে বিরোধিতা করতে পারতেন। মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান রামচন্দ্রকে মাঝখানে টেনে আনার কি কোনো প্রয়োজন ছিল? তিনি তো জানতেন রাম প্রত্যেক হিন্দুর প্রাণের দেবতা। প্রত্যেক ঘরে ঘরে রামায়ণ গীত বা পঠিত হয়। প্রায় ৬৮ শতাংশ হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে বাস করে। তাহলে একটি রাজনৈতিক দলের বিরোধিতা করতে গিয়ে তিনি কি সমগ্র হিন্দু জাতির বিরোধিতা করলেন না? দেশের প্রত্যেকটি হিন্দুর ভাবাবেগকে আঘাত করলেন না? মহান কবি কৃত্তিবাসের অপমান করলেন না? তিনি তো বিষয়টি অন্যভাবে দেখতে পারতেন। তিনি নিজে যদি 'জয় শ্রীরাম' বলতেন তাহলে কি কোনো ক্ষতি হতো, তিনি তো নিজে তার রাজনৈতিক দলের স্লোগান 'জয় শ্রীরাম' বলতে পারতেন। আসলে ভোটব্যাঙ্কের জন্য একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষকে খুশি করার

রামরাজাতলা, হাওড়ায় শ্রীরামের মন্দির

বিষ্ণুপুরের মন্দিরে টেরাকোটায় রাম

পুরুলিয়ার সীতাকুণ্ডে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ

জন্য তিনি 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনির বিরোধিতা করলেন। এই ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীকে সমর্থন করতে দেখা গেছে নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকে। বরাবরই বিতর্কপ্রিয় অমর্ত্যবাবু মুখ্যমন্ত্রীর জাগিয়ে তোলা 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনির বিরোধিতা করেন। তিনিও মনে করেন 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি বাঙ্গালির সংস্কৃতি নয়। ৫ জুলাই কলকাতার এক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে অমর্ত্যবাবু 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনির তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি জানান— 'জয় শ্রীরাম স্লোগান কিন্তু 'মা দুর্গার মতো বাঙ্গলার সংস্কৃতির অঙ্গ নয়। তাঁর মতে মা দুর্গা বঙ্গজীবনে সর্বত্র বিরাজিত। আজকাল রামনবমী খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, আমি আগে কখনও শুনিনি। জয় শ্রীরাম স্লোগান বাঙ্গলার সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে নেই।' কিন্তু অর্থনীতির অমর্ত্যবাবু হয়তো 'রাজবাড়ির দুর্গোৎসব'-এর মতো বইগুলো পড়েননি। কেননা তাহলে বুঝতে পারতেন বঙ্গপ্রদেশে দুর্গোৎসবের সূচনা সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে। আর রামনামের সূচনা পঞ্চদশ শতকের মহাকবি কৃত্তিবাসের হাত ধরে। কৃত্তিবাস ওঝার 'শ্রীরাম পাঁচালী' বাঙ্গালির ঘরে ঘরে এমনই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল যে আজ পর্যন্ত আর দ্বিতীয় কোনো কাব্য বা সাহিত্য এতটা জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। প্রত্যেক বাঙ্গালি সকাল সন্ধ্যা রাম নামে দিন অতিবাহিত করে। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ, রাঢ়বঙ্গ থেকে জঙ্গলমহল সর্বত্র রাম নামের ছড়াছড়ি। এমন কোনো লোকজীবন নেই বা এমন কোনো লোকসংস্কৃতি নেই যেখানে রামায়ণের প্রভাব পড়েনি। রামের মতো পতি বা লক্ষ্মণের মতো দেবর লাভ প্রত্যেক বাঙ্গালি ঘরের মেয়েদের কামনা। কুশান গান, বোলান গান বা সারি, টুসু, জারি, পটচিত্র বা প্রাচীন মন্দির ভাস্কর্যে রামায়ণের ছাপ সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। মানুষের মনন থেকে শুরু করে সংস্কৃতি এমন কোনো দিক নেই যেখানে রামায়ণের প্রভাব পড়েনি। তাহলে কোনো যুক্তিতে বলবো বাঙ্গলার সংস্কৃতিতে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দেওয়া যাবে না বা এটা বাঙ্গালির সংস্কৃতি নয়?

বাংলা সাহিত্যও কখন রাম-রামায়ণ বর্জিত হয়নি। কৃত্তিবাস ওঝার পরে একাধিক কবি রামায়ণ রচনা করেছেন। কবি নিত্যানন্দ, শিবানন্দ সেন, ফকিররাম কবিভূষণ, ভবানীশঙ্কর, কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী, জগৎরাম রায় সকলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাব্য রচনা করেছেন। এমনকী মধ্যযুগের একমাত্র মহিলা কবি চন্দ্রাবতীও সপ্তদশ শতাব্দীতে রামায়ণ রচনা করেন। উত্তরবঙ্গের দুজন বিখ্যাত রামায়ণের কবি হলেন দুর্গাবরের 'গীতিরামায়ণ' এবং অদ্ভুতাচার্যের 'অদ্ভুত রামায়ণ' (সপ্তদশ শতাব্দী)। এমনকী এই বঙ্গদেশে বসে একাধিক কবি তাদের সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ লিখেছেন। ৯ম শতকে অভিকর রচিত 'রামচরিত' ১০ম শতকে সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' তাদের মধ্যে বিখ্যাত। তাই কোনো যুক্তিতেই এটা বলা যায় না রাম নাম বাঙ্গালির সংস্কৃতি বহির্ভূত।

এই সংস্কৃতিগত বিতর্কের সূত্র ধরে পশ্চিমবঙ্গে আর একটি বিতর্কের জন্ম হয়েছে। তবে এই বিতর্কের মূলে রয়েছে ধর্ম। খোলাখুলি বলতে গেলে হিন্দুধর্ম। কিন্তু যারা বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন তাদের মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না সংস্কৃতি ও ধর্ম এক না হলেও একে অপরের পরিপূরক। শুধু সংস্কৃতি সংস্কৃতি বলে চিৎকার করলেই হয় না তার গুরুত্বটাও বোঝা দরকার। কিন্তু বিতর্কের সৃষ্টিকর্তা তিনজন অভিনেতা অভিনেত্রী কেউই এর গুরুত্ব বোঝার চেষ্টা করেননি। সম্প্রতি একটি টিভি শো-তে গিয়ে এই বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন অভিনেতা অনিন্দ্য চ্যাটার্জি, দেবলীনা দত্ত ও সায়নী ঘোষ। বিতর্কে অংশ নিতে গিয়ে অনিন্দ্যবাবু একটি রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে জানান— 'আমরা কী খাব সেটাও ঠিক করে দেওয়া হচ্ছে। আমি তো ইচ্ছে করলে নবমীতেও বিফ খেতে পারি।' আর দেবলীনা দত্ত বলেন, 'আমি মাংস খাই না। তবে রান্না করতে পারি। নবমীর দিন বিফ রান্না করতে আমারও কোনও অসুবিধে নেই।' অনিন্দ্যবাবু শুধু বিফ কেন, সব ধরনের মাংস খেতে পারেন। দেবলীনাও সব ধরনের মাংস রান্না করুন। এতে তো কারও মনে আঘাত লাগার কথা নয়। কিন্তু অনিন্দ্যবাবু এসব বলার সময় 'নবমী' শব্দটি কেন ব্যবহার করলেন? উনি 'নবমী' শব্দের পরিবর্তে জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি বা কোনো নির্দিষ্ট তারিখের কথা বলতে পারতেন। উনি কি জানেন না নবমী হিন্দুদের বিশেষ উৎসব? সমগ্র বাঙ্গালি দুর্গাপূজার এই দিনগুলিতে আনন্দে মেতে ওঠে। তাহলে কি বলবো কেবলমাত্র হিন্দুদের আঘাত করবার জন্যই তিনি 'নবমী' শব্দের সঙ্গে 'বিফ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এই স্বাধীনতা তো ওকে কেউ দেয়নি। তাছাড়া 'নবমী' তো ওর ব্যক্তিগত উৎসব নয়। তাহলে যারা বাঙ্গালি সংস্কৃতির পাঠ শেখানোর জন্য সর্বদা টিভির পর্দায়, বিভিন্ন নিউজ চ্যানেলে বসে থাকে, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কলম ধরে তারা কোন ধরনের সংস্কৃতির পাঠ দিতে চাইছেন। এটি কি বাঙ্গালির সংস্কৃতি? নাকি সায়নী ঘোষ হিন্দুদের দেবতা শিবকে নিয়ে যে পোস্ট করেছেন সেটি বাঙ্গালির সংস্কৃতি? হিন্দু সংস্কৃতিকে বিকৃত ভাবে উপস্থাপন করা কি বাঙ্গালির সংস্কৃতি? তিনি কি জানতেন না এর ফলে হিন্দুদের ভাবাবেগে আঘাত লাগতে পারে? তিনি যে ধরনের পোস্ট করেছেন এর ফলে ২৯৫-এ নং ধারা লঙ্ঘন হতে পারে। তিনি হয়তো কবি শ্রীজাতের মতো বিতর্কের জন্ম দিয়ে মিডিয়ার সামনে আসতে চেয়েছেন। না হলে এই ধরনের পোস্ট কেন? আসলে এরা সুষ্ঠু সংস্কৃতিকে বিকৃত করাকেই ব্যক্তি স্বাধীনতা মনে করে। সে কারণেই একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে খুশি করার জন্য হিন্দুদের ভাবাবেগকে আঘাত করে। বাঙ্গালিকে সংস্কৃতির পাঠ দিতে গিয়ে ভুলে যায় কোনটি সংস্কৃতি, আর কোনটি অপ-সংস্কৃতি? অতি আধুনিকতার ছোঁয়ায় তাদের অপ-সংস্কৃতিকেই প্রকৃত সংস্কৃতি বলে মনে হয়।

তাই এরকম ঘৃণ্য মানসিকতার কেউ বাঙ্গালিকে সংস্কৃতির পাঠ দিতে চাইলে বাঙ্গালি গ্রহণ করবে কিনা তা বাঙ্গালি বিদগ্ধ সমাজ ভেবে দেখবে। কিন্তু সুস্থ বাঙ্গালি সংস্কৃতির বিকৃতি অবিলম্বে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। প্রকৃত বাঙ্গালি বহন করছে বাঙ্গলার সংস্কৃতিকে। রামকে যেমন বাঙ্গালির মন থেকে কখনো মুছে ফেলা যায়নি, যাবে না, তেমনি 'বুলদির শিবরাত্রি'র মতো সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্ট বাঙ্গালি কখনও মেনে নেবে না। তাই পরিশেষে মহাকবি বাল্মীকির কথায় বলবো—

'যাদব স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্ রামায়ণ কথা লোকেষু প্রচারিষ্যত।।

অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত পৃথিবী পৃষ্ঠে পর্বত থাকবে, যতদিন পর্যন্ত নদীগুলি প্রবাহিত হতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত রামায়ণের কাহিনি জনমানসে প্রচারিত হবে। রামায়ণ কেন্দ্রিক বাঙ্গালি সংস্কৃতিও অক্ষয় অমর হয়ে থাকবে। কোনো অপসংস্কৃতির প্রভাব এর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। □

রম্যরচনা

গুরুর আশীর্বাদ

এক যুবক তার গুরুদেবের শ্রীচরণ স্পর্শ করে ভক্তি গদগদ স্বরে বলল— 'গুরুদেব, কী করলে আমি অন্তরাত্মার সাক্ষাৎ পাব, নিজের দোষ-ত্রুটি সব দেখতে পাব?

গুরুদেব তার মাথায় শ্রীহস্ত স্পর্শ করে আশীর্বাদ করে বললেন, 'বাবা, তুমি শীঘ্র বিয়ে করে নাও, তাহলেই দেখবে তোমার স্ত্রী শুধু তোমার নয় চোদ্দপুরুষের যাবতীয় দোষ-ত্রুটি দিনে অন্তত ২৭ বার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে যাতে তোমার সব ভুলভ্রান্তি সবসময় মনে থাকে।

*****

ভেরি গুড

বাংলা ব্যাকরণ পড়ানোর সময় শিক্ষক এক অন্যমনস্ক ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলেন— 'সুমন, সর্বনাম পদের দুটো উদাহরণ দাও।'

সুমন হকচকিয়ে বলল— 'কে? আমি?'

শিক্ষক খুশি হয়ে বললেন— 'ভেরি গুড।'

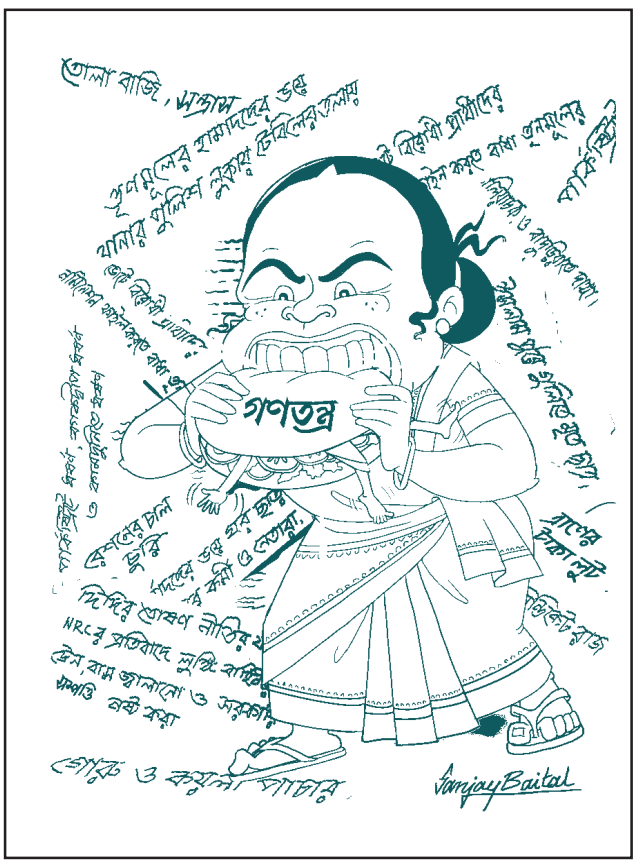

উবাচ

"দেশভক্ত হওয়া হিন্দুদের প্রাথমিক চরিত্র। তাদের সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক চরিত্রবিন্যাসের মধ্যেই রয়েছে দেশের প্রতি শ্রদ্ধা। এই কারণে কোনো হিন্দুর পক্ষে দেশবিরোধী হওয়া সম্ভব নয়।"

মোহনরাও ভাগবত
সরসঙ্ঘচালক, আর এস এস
দিল্লিতে একটি পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠানের বক্তব্যে

"আমরা পাকিস্তান বা কোনো ইসলামিক দেশে বাস করছি না। এটা আমাদের কাছে কষ্টদায়ক। উনি চুপ করে থাকতে পারতেন। আমরা ওনাকে ভালোবেসে ভোট দিয়েছিলাম। আমাদের আশীর্বাদের মর্যাদা দিলেন না। আমরা ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত।"

বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী
উদ্ধারণ মঠের সন্ন্যাসী
'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে মমতা ব্যানার্জির অপমানিত বোধ করার প্রসঙ্গে

"করোনা মোকাবিলায় ভারত ও সে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অবদানের জন্য অনেক ধন্যবাদ। ভয়ানক এই ভাইরাসের মোকাবিলায় আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে।"

ট্রেড্রোস আধানম গেব্রেসাস
'হু'-র প্রধান
ভারতে করোনা মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা সম্পর্কে মন্তব্য।

"সমস্ত ভোটারকে সচেতন করুন, নিরাপদ রাখুন ও সমস্ত বিষয়ে অবহিত করুন। কোনো ভাবে যেন ভয়ের পরিবেশ তৈরি না হয়।"

জগদীপ ধনকড়
রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ
জাতীয় ভোটার দিবসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে টুইটে।

শব্দরূপ-৬ (বিষয় অভিমুখ স্বদেশী আন্দোলন) **অরুণ কুমার ঘোড়ই**

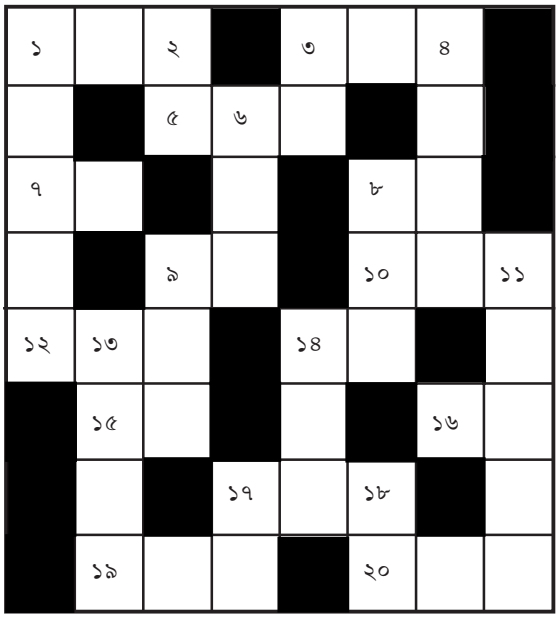

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. 'রাখি—'।
৩. চিত্তরঞ্জন দাশ এই দল তৈরি করেন।
৫. মহান ব্যক্তির গুণ।
৭. মদগর্বিতা, আস্ফালন।
৮. '—ভুবনমনমোহিনী'—(রবীন্দ্রনাথ)।
৯. কুড়ি (অঙ্ক)।
১০. তাম্রলিপ্ত, বালিয়ার মতো এখানেও স্বঘোষিত সরকার তৈরি হয়েছিল।
১২. স্বাদেশিকতায় প্রেরণা দাতা এক 'সেন' কবি।
১৪. বাঞ্ছনীয়।
১৫. নামের মিলে লালা লাজপত ও প্রফুল্লচন্দ্র।
১৬. '—, নমো, নমো সুন্দরী মম'— (রবীন্দ্রনাথ)।
১৯. নেতা।
২০. গান্ধীজীকৃত সত্যাগ্রহের একটি।

উপর-নীচ : ১. বঙ্কিমচন্দ্রের পত্রিকা। ২. প্রণাম।
৩. ডালহৌসির '—বিলোপ সমানতার ভাব। ৪. জনক।
৬. 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'-এর মুখার্জি।
৮. সমানতার অভাব।
৯. অলিন্দযুদ্ধের তিন শহিদের একজন।
১১. নব জাগরণ যুগের এক সংস্কারক।
১৩. বীর নারী।
১৪. 'দুর্গম গিরি—মরু'—(নজরুল)।
১৭. কথা।
১৮. দীনবন্ধুর দর্পণ।

(● আগামী সংখ্যায় সঠিক উত্তরদাতাদের নাম প্রকাশ করা হবে।)

শোক সংবাদ

দক্ষিণ কলকাতার বেহালা শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির সহ-সভাপতি তপন গাঙ্গুলি গত ২৩ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। দীর্ঘ ৪০ বছর তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে ভারত সরকারের আয়কর বিভাগের বিভিন্ন অধিকারিকের দায়িত্ব সুনামের সঙ্গে নির্বাহ করেছেন। এছাড়াও বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রবীণ কার্যকর্তারূপে আমৃত্যু দায়িত্ব পালন করেছেন। ক্রীড়াভারতীর শুরুতে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাস্তুহারা সহায়তা সমিতিতে ২০ বছর বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন।

****

হাওড়া জেলার বাউড়িয়া শাখার স্বয়ংসেবক বিভূতি শাসমল গত ৩১ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র, ৩ ভাই ও পাঁচ বোন রেখে গেছেন।

****

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বাঁকুড়া জেলার সহ সেবাপ্রমুখ তথা বিষ্ণুপুর নগরের স্বয়ংসেবক জয়ন্তী শীলের মাতৃদেবী সরস্বতী শীল গত ২৬ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। তিনি ১ পুত্র, ৪ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

****

কলকাতা সল্টলেক শাখার স্বয়ংসেবক ভরত কুমার বাগলা গত ২৮ জানুয়ারি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি ১ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি পূর্বতন প্রাপ্ত ব্যবস্থা প্রমুখ শিব কুমার বাগলার ভ্রাতুষ্পুত্র।

****

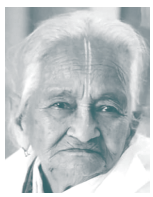

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর দিনাজপুর জেলার পূর্বতন মহকুমা সঙ্ঘচালক নিমাইচন্দ্র মণ্ডলের মাতৃদেবী শান্তিরানি মণ্ডল গত ২০ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। তিনি ৫ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

****

জলপাইগুড়ি জেলার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পূর্বতন জেলা সম্পাদক পতিতপাবন রায় গত ১ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র, পুত্রবধূ, ১ কন্যা ও ১ নাতনি রেখে গেছেন।

তাঁর পুত্র পিনাকী রায় সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক তথা হিন্দু জাগরণ মঞ্চের জলপাইগুড়ি জেলার প্রচার প্রমুখের দায়িত্বে রয়েছেন।